দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ১৬ সংখ্যা ❖ ২ জানুয়ারি ২০২৬

আবদুল হালিম

৬ ডিসেম্বর ১৯০১ ■ ২৯ এপ্রিল ১৯৬৬

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

প্রবন্ধ

- একবিংশ শতাব্দীর পঁচিশ বছর এবং — সৌর বসু — ৩
- লালন ফকির — তানভীর মোকাম্মেল — ৪
- তাঁর সমন্বয় সাধনা পাঠককে প্রাণীত করবে — মিলন দত্ত — ৮
- মন্দির-মসজিদের রাজনীতি — মজিবুর রহমান — ১০
- ফ্যাসিবাদের আগুনে উপমহাদেশ — সৌম্য শাহীন — ১২
- বাপুর বদলে রাম — অশোক সরকার — ১৪

শ্রদ্ধাঞ্জলী

- আবদুল হালিম — ১৫

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ কোন পথে যাবে ? — শুভ বসু — ১৬
- প্রতারিত বাংলাদেশের মানুষ — মনিরুল হক — ১৮

ইতিহাস

- জাতীয় কংগ্রেসের একশো চল্লিশ বছর — সায়ক ঘোষ চৌধুরী — ২০
- ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ — শান্তনু দত্ত চৌধুরী — ২১

ধারাবাহিক

- জরুরী অবস্থার পরবর্তী পরিস্থিতি ও সিপিআই দলের পতনের সূচনা — সুশান্ত দাশগুপ্ত — ২৫

স্মরণ

- খালেদা জিয়া — সুষুপ্ত পাঠক — ২৬

দেশের খবর

- অসমের কার্বি পাহাড়ের জন বিক্ষোভ — কমলেশ গুপ্ত — ২৭
- গণপিটুনি প্রগতির মুখোশ — সুকুমার মিত্র — ২৯
- আরাবল্লী সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট — অমিতাভ সিংহ — ৩০
- ভিবি-জি রাম জি বিল এর বিরোধীতা — শুভাশিস মজুমদার — ৩১
- নির্বাচন কমিশন সৃষ্ট অরাজকতা, সিপিআই (এম এল) লিবারেশন — ৩২

বইয়ের খবর

- মহাত্মা গান্ধির প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ — ৩৩
- বন্ধুতার পাতা সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রীয় মদতে ধর্ম ভাষা বর্ণের ভিত্তিতে আক্রমণ

২০২৫ সালের ঘটনাবলীর দিকে পিছু ফিরে দেখতে গেলে যা দেখা যায় তা হচ্ছে একতরফা ঘৃণা, হিংসা, আক্রমণ। না, সারা দেশে যা ঘটেছে, ঘটে চলেছে, সে সব কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, এ সবই রাষ্ট্রীয় মদতে সংগঠিত আক্রমণ। অন্য ধর্মের (পড়ুন মুসলমান ও খ্রিস্টান) প্রতি ঘৃণা থেকে উৎপাদিত হিংসা ও আক্রমণ এখন সর্বদাই রাষ্ট্রের কাছ থেকে নীরব সম্মতি লাভ করে থাকে আজ পর্যন্ত কোনও বিজেপি শাসিত রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে কখনও কোথাও রাষ্ট্র আক্রান্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। উল্টে সুপ্রিম কোর্টের রায় উপেক্ষা করে আক্রান্তদের বাড়ি-ঘর, দোকান - পাট, এমনকি ধর্মস্থানের ওপর বুলডোজার চালানো হয়েছে। আসলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার এখন রাষ্ট্র শাসনের পদ্ধতি। আর.এস.এস ও বিজেপি মনে করে এই দেশ ভারতবর্ষ একটি হিন্দু রাষ্ট্র। ভারত বহু ধর্মের দেশ নয় আর.এস.এস ১৯২৫ সালে তাদের জন্মলগ্ন থেকেই এই মতাদর্শ প্রচার করে চলেছে ! তারা কোনও দিন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয় নি। তাদের কোনও নেতা কোনও দিন কারাবাস করেননি। এরা মনে করতো হিন্দু জনসাধারণের ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, হিন্দুদের দ্বন্দ্ব বিধর্মী মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে। আর.এস.এস- এর দ্বিতীয় সর-সঙ্ঘ-চালক মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর সঙ্ঘের জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সালে বলেন— 'হিন্দুস্তানের অ-হিন্দু মানুষদের দুটোর মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হবে। হয় তাঁরা হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষাকে মেনে নেবেন,হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করবেন,হিন্দুকে মর্যাদা দেবেন ও শ্রদ্ধা করবেন, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির গরবকীর্তন ছাড়া অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না.....এক কথায় তাঁদের বিদেশি হয়ে থাকা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় তাঁরা এদেশে থেকে যেতে পারেন,কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হিন্দুজাতির অধীন হয়ে। কোনও কিছুর ওপর কোনও দাবি থাকবেনা তাঁদের, থাকবে না কোনও বিশেষ অধিকার। কোনও বিশেষ সুবিধা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা— এমনকী নাগরিক অধিকারও না (We or Our Nation Defned–pp.556 by M. (Golwalkar—1938—Nagpur- Bharat Prakashan.)"।

অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী ' নাগরিকত্ব ' অধিকার .নয় এখন বর্তমান সংবিধানের আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই. । হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবারের নির্ধারিত সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে। পরম পুজনীয় গুরু গোলওয়ালকর এর নির্দেশ অনুযায়ী ' অপর ' চিহ্নিত করতে হবে। তিনি নির্দেশ করে গিয়েছেন অপর হচ্ছে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা। এরা এখন ' অপর ' সন্ধান করে পেয়েছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী অর্থাৎ ঘুষপেটটিয়া, রোহিঙ্গা ও দলিত। সারা দেশজুড়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যসমূহে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে পুলিশ ও স্বঘোষিত সেবকরা। কোনও আধার কার্ড, ভোটার কার্ড কিছুই তারা মানেনা। অনেকে মারধর খেয়ে রাজ্যে ফিরতে পেরেছে। আবার শিশুপুত্রসহ অন্তঃসত্ত্বা নারীকে দিল্লী থেকে ধরে গভীর রাতে আসাম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে Push back করা হয়েছে। কয়েকজনকে পে-লোর্ডার দিয়ে হাসনাবাদ সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে নিক্ষেপ করা হয়েছে। যেনো এরা মানুষ নয়। বস্তা ভর্তি মালপত্র । অন্তত ৪০ জন রোহিঙ্গাকে গভীর সমুদ্রে লাইফ জ্যাকেট দিয়ে জলে নামতে বাধ্য করেছে এই রাষ্ট্রের প্রহরীরা। তাঁরা তারপর কোথায় গেলেন কেউ জানেনা। গত একবছর ধরে গো - রক্ষার নামে পিটিয়ে খুন, রামনবমীর মিছিল থেকে মসজিদের সামনে মিছিল নিয়ে যাওয়া ও মসজিদের সামনে ডিজে বাজিয়ে উৎকট নৃত্য, মসজিদের ওপর গৈরিক পতাকা টানিয়ে দেওয়া এসব চলছে বাধাহীন ভাবে ।প্রাচীন যে কোনও মসজিদ ধরে দাবি করা যে এর নিচে অবশ্যই কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ১৯৪৭ এর পর বাবরি মসজিদ বাদে সব মসজিদ বা মন্দিরে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে এই মর্মে প্রণীত আইন কে পদে পদে অমান্য করা হচ্ছে।

দেশের এক বিস্তীর্ণ প্রান্তে খুশির বড়দিন এখন আর শুধু খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উৎসব অনুষ্ঠান নয় সব ধর্মের মানুষ এই আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। দেশ জুড়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের সময় উগ্র ধর্মান্ধ শক্তি একযোগে চার্চ, স্কুল, দোকান পাটের ওপর নগ্ন একতরফা আক্রমণ চালায়। প্রশাসন নীরব দর্শক ছিল। দেশজুড়ে এই সন্ত্রাস এর নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বাক্যও খরচ করেন নি। দোষীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এইবার এই শক্তি আর একটি ' অপর ' সম্প্রদায় চিহ্নিত করেছে। ভাষা ভিত্তিক বিভাজন। সেটি হচ্ছে বাংলাভাষী মানুষ। আর সেই মানুষ যদি মুসলমান হয় তাহলে তো কথাই নেই। নিশ্চিত ভাবে সে বাংলাদেশী। ঘুষপেটটিয়া অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী। তাদের মুখের ভাষা নাকি বাংলা ভাষা নয় এটি ' বাংলাদেশী ' ভাষা। এখন ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন। বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতে বাংলাভাষী শ্রমজীবী মানুষদের বসতি গুলির ওপর আক্রমণ চলছেই। কোনো বিরাম নেই । হিন্দু হলেও রেহাই নেই। ওড়িশার মালকান গিরি অঞ্চলে অন্তত ২৫০ বাঙালি উদ্বাস্তুর বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে এই ধর্মান্ধ শক্তির আক্রমণে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় এলেন। এই সব হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথা বললেননা। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে দলিত ও নিম্ন বর্ণের মানুষের ওপর আক্রমণ। তাঁদের দল ও উচ্চ বর্ণের প্রতি আনুগত্য আছে কিনা দেখা হয়। দলিতদের হত্যার করা, তাঁদের মাথায় মুত্র ত্যাগ করা, দলিত কন্যাদের ধর্ষণ করা, এসবই এখন হিন্দি বলয়ের স্বাভাবিক ঘটনা। ' অপর ' নির্মাণ কমিউনাল ফ্যাসিস্তদের অন্যতম বৈশিষ্ট। হিটলার যেমন ইহুদি ও শ্লাভ জাতির লোকদের প্রধান শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন.। লক্ষ লক্ষ ইহুদি, শ্লাভ, কৃষ্ণকায় মানুষ কে হিটলার ও মুসোলিনি হত্যা করান। তারপর যুদ্ধন্মাদনা সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে ৮ কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয় ফ্যাসিস্টরা। গোলওয়ালকর মনে করতেন হিটলার-এর প্রদর্শিত পথই ভারতের জাতি সমস্যার সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ।

তাই পহেলগাওতে নৃশংস নিষ্ঠুরতার সাহায্যে সন্ত্রাসবাদীরা ২৭ জন নিরীহ পর্যটকদের হত্যা করার পর কেউ শাস্তি পেলোনা, কোনও দায় দায়িত্ব খুঁজে দেখা হল না। যুদ্ধের দামামা বাজানো হল। ২০১৯ এ পুলওয়ামাতে যা হয়েছিলো তাই হল। ৪৫ জন C.R.P জওয়ান নিহত হয় তাদের Convoy-RDX Explosion করানোর ফলে। কেউ শাস্তি পায়নি। সেবারও যুদ্ধের দামামা বাজানো হয়েছিলো। এবার Operation সিঁদুর ৩ দিনের মাথায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-- এর ধমক খেয়ে বন্ধ করতে হয়েছে। এতো ভাব ট্রাম্প- এর সঙ্গে এখন মোদী ভয়ে তার সামনে যান না। ট্রাম্প এর আশীর্বাদ এখন পাক জেনারেল আসিফ মুনির এর মাথায়।

এইসব ঢাকার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ চলছে।

অর্থনীতি চৌপাট। ৯০ টাকায় ১ ডলার জনগণ সব দেখছেন।

দেশের এই গভীর সঙ্কটে যখন ঘৃণা ভালোবাসার জায়গা নিচ্ছে তখন আমরা পত্রিকার শেষে চার পৃষ্ঠার 'বন্ধুতার পাতা' শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র সংযোজন করলাম। এটির পরিকল্পনা করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতির অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্ত। তিনি সম্প্রীতির জন্য দীর্ঘজীবন ধরে কাজ করছেন।

প্রবন্ধ

একবিংশ শতাব্দীর পঁচিশ বছর এবং ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি রিপোর্ট

সৌর বসু

এই শতাব্দীর ২৫ বছর বহুস্তরীয় ঘটনা এবং বিবিধ আর্থ সামাজিক রূপান্তরের স্বাক্ষী। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দৌলতে পুঁজির অপ্রতিরোধ্য গতি। কর্পোরেট দুনিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ। অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও দুনিয়া জোড়া তীব্র অর্থনৈতিক অসাম্য ।

এই শতাব্দীর শুরুতেই ঘটেছিল আমেরিকার পুঁজিবাদের প্রতীক টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা । পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট বুশের ইরাক আক্রমণ মার্কিন দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই আক্রমণের সমাপ্তি ঘটে সাদ্দাম হোসেনের পতন ও হত্যার মাধ্যমে। নতুন শতাব্দীর শুরুতেই প্রতিহিংসা এবং বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবী জুড়ে । আজও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেশে দেশে যুদ্ধ এবং প্রতিহিংসার শিকার হতে হচ্ছে দুর্বল সম্প্রদায়কে। আমেরিকার মদতে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার ইরান সহঙ্ক লেবানন , সিরিয়া প্রমুখ দেশগুলি। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা বৃদ্ধি করেছে। যুদ্ধ চলছে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে। যার অভিঘাত এসে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়াসহ অন্যান্য প্রাচ্যের দেশগুলোর অর্থনীতির উপর।

২০০৭ এবং ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে সমগ্র বিশ্ব। আমেরিকার বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলো দেউলিয়া হতে শুরু করে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ আক্রান্ত হয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমে যায়। বিনিয়োগ কমে আসে। আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা হ্রাস পায়। এশিয়ার রপ্তানি নির্ভর দেশগুলির উপর আঘাত নেমে আসে। যদিও ভারত এই অর্থনৈতিক আঘাত থেকে নিজেদের কিছুটা সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ হয়। Bail out এর মাধ্যমে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াস শুরু হয়। ২০১৯ সালে শুরু হয় কোভিদ মহামারী। এই মহামারীর ফলে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মহামারীর মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশে লকডাউন শুরু হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। জরুরি পণ্যের অভাব দেখা দেয়, বিশ্বব্যাপি সরবরাহ শৃংখল আক্রান্ত হয়। বিমান পরিবহন , পর্যটন , ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়। খোদ আমেরিকাতে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের অর্থনীতিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। সমগ্র পৃথিবীতে কুড়ি মিলিয়নের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। কোভিদ মহামারীর ফলে অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয় তার প্রভাব থেকে এখনো পৃথিবী মুক্ত হতে পারেনি।

অন্যদিকে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের পথ সুগম হয়। ইন্টারনেট স্মার্টফোনের প্রসারের ফলে ব্যাংকিং,, ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে শুরু করে পরিবহন গণমাধ্যম শিক্ষা, প্রশাসন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার প্রভৃতি সামাজিক প্ল্যাটফর্মের উদ্ভাবন প্রভাব ফেলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ডিজিটাল টেকনোলজি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কম্পিউটার সাইন্সের উন্নতির ফলে সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু আমরা যদি ভেবে দেখি পৃথিবী কিরকম আছে ? তাহলে দেখতে পাবো প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোতে ঘূন ধরিয়ে দিচ্ছে। গণতন্ত্রের ক্ষয় হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মানুষে মানুষে বিভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অসাম্য পৃথিবী জুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি রিপোর্ট। সমগ্র পৃথিবীর দুশো জন গবেষক, সমগ্র বিশ্ব থেকে তথ্য আহরণ করে এই কাজ করেছেন। রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে বৈষম্য আজ শুধু আয় বা সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আর্থসামাজিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা, লিঙ্গ বৈষম্য ,গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

এই রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে বিশ্ব জনসংখ্যার শীর্ষ ধনী সম্প্রদায় বাকি ৯০%র থেকে বেশি আয় করে।

অপরদিকে বিশ্বের দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ জনসংখ্যা মোট বিশ্বব্যাপী আয়ের ১০ শতাংশের কম রোজগার করে। সম্পদের ক্ষেত্রে যেখানে নিচের মানুষের হাতে দুই শতাংশ সম্পদ রয়েছে সেখানে ধনী সম্প্রদায় বিশ্বব্যাপী সম্পদের ৭৫ শতাংশের অধিকারী। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিটজ দেখিয়েছেন যে ২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে অতি ধনী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়েছে। সমগ্র দুনিয়াতে এই প্রবণতা চোখে পড়ছে। ভারতবর্ষে এই প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট।

ভারতের শীর্ষ এক শতাংশ ধনীদের সম্পদ বেড়েছে ৬২ শতাংশ। ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে ব্রিটেনের মত ধনতান্ত্রিক দেশে শীর্ষ এক শতাংশ ধনী যেখানে মোট সম্পদের একুশ শতাংশের মালিক, সেখানে ভারতের শীর্ষ এক শতাংশ সম্পদশালী দখলে রয়েছে দেশের ৪০ শতাংশ সম্পদ।

অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মতে এই তীব্র অসাম্য দূর করার জন্য এবং আর্থিক অবস্থা উন্নতি সাধনের জন্য অনেক কিছুই করা সম্ভব। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কাজ করছে পুঁজির অবাধ গতি। দুনিয়া জোড়া আর্থিক বৈষম্য এবং দরিদ্র মানুষদের সহায়তা করার জন্য একটি বৈশ্বিক নীতির প্রয়োজন আছে বলে কৌশিক বসু মনে করেন। যদিও এই সমস্যা সহজে মেটার নয়। কারণ রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ এখানে জড়িত । সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকেই সংগঠিত হতে হবে অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। জোসেফ স্টিগলিটজের রিপোর্টে উল্লেখ পেয়েছে যে এই তীব্র অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সকল দেশের সহযোগিতার প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা সহজসাধ্য কাজ নয়। তবে পৃথিবীতে অনেক দুরুহ কাজের সমাধান সম্ভব হয়েছে। আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে করে পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায় অসাম্য দূর করার ক্ষেত্রে। নতুন বছরের প্রারম্ভে এটাই আমাদের কামনা।

লালন ফকিরের উপর সুফিবাদের প্রভাব

তানভীর মোকাম্মেল

[লেখক বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক তিনি একই সঙ্গে সাহিত্য . সমাজ, সঙ্গীত, লোক -- সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধকার। লেখক এই বিষয়ের ওপর তাঁর এই বক্তৃতাটি ইংরেজি ভাষায় প্রদান করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুবাদ লেখকের নিজস্ব। অতীব মূল্যবান এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। আজ প্রবন্ধটির তৃতীয় কিস্তি প্রকাশিত হল। — সম্পাদক, নাগরিক]

(৩)

যেহেতু 'অচিন মানুষদ মানবদেহের ভেতরে বাস করে ফলে প্রতিটা মানুষের ভেতরেই মানুষরতনও বিরাজমান। সে কারণেই লালন ও ওঁর অনুসারীদের কাছে মানবদেহের কোনো কিছুই অপবিত্র নয় এবং সে বিশ্বাসটি এতটাই চরমে যে মানবদেহের চার বর্জ্য;বীর্য্য, ঋতুস্রাবের রক্ত, মুত্র ও মল, পান বা খাওয়া চলে। এসব চর্চা হচ্ছে একান্তই এদেশের প্রাচীন দেহকেন্দ্রিক যোগতান্ত্রিকতা যার সঙ্গে পারস্যের সুফিবাদের কোনোই সম্পর্ক নেই।

মানবদেহকেন্দ্রিক লালনের এই মানবতাবাদ, মানুষকে সব কিছুর কেন্দ্রে উপস্থিত রেখে এই যে সাধনা, এটা ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে আসেনি। দেশজ মানবতাবাদের এই দর্শনটি একান্তভাবেই সৃষ্ট, ধারিত ও প্রচারিত হয়েছে বাংলার দেহকেন্দ্রিক মানবতাবাদী সাধকদের দ্বারা, লালন ফকিরের অবস্থান যাঁদের শীর্ষে।

কিন্তু মানবতাবাদী যে লালন, তাঁর কাছে তান্ত্রিক-সহজিয়াপন্থীদের এই ত্যারি চন্দ্রদ বা 'পঞ্চরস'-য়ের সাধনাও যেন ঠিক মূল লক্ষ্য নয়। ওঁর জন্যে, আগেও যেটা বলেছি, সাধনার লক্ষ্যটা ছিল;প্রেম। শরীরী কামনাকে জয় করে প্রেমের স্তরে পৌছানো। তাই নারীর সঙ্গে মিলনে বীর্য্যপাতের চেয়ে উর্ধ্বরতির সাধনাটা লালনের সাধন প্রক্রিয়ায় এত জরুরী। ভোগে নয়, মুক্তি;প্রেমে।

যেহেতু অধরা মানুষকে ধরা সহজ নয়, সহজ নয় আনুষরতনদ হতে পারা, তাই প্রকৃত সাধক হতে হলে একজনকে সকল জাগতিক কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে হয়, হতে হয়;তজ্যান্তে-মরাদ। আর তার জন্যে প্রয়োজন পরম দীক্ষা;ভেক-খিলাফত। জাগতিক কামনা-বাসনা ত্যাগ করে জীবিত মানুষের দেহে মৃত মানুষের পোশাক পরা। সে কারণেই লালন-অনুসারী ফকিরদের কাপড়ের রংটা মৃত মানুষের কাফনের রং-সাদা।

খিলাফত অর্জনের এই রীতিটি, বৈষয়িক জীবন ত্যাগ করে মৃত্যু পর্যন্ত সাদা কাপড় পরে থাকা, কিছুটা সুফিদের বৈষয়িক জীবন ত্যাগের ঐতিহ্য থেকেও যেন আহরিত;

' কে তোমারে এ বেশ-ভূষণ পরাইল বল শুনি
জিন্দা দেহে মুরদার বেশ খিলকা-তাজ আর ডোর-কোপনি ।।
জ্যান্তে মরার পোশাক পরা
আপন ছুরাৎ আপনি সারা
ভব-রোগকে ধ্বংস করা
দেখে অসম্ভব করণী ।।

মরণের আগে যে মরে
শমণে ছোঁবে না তারে
শুনেছি সাধুর দ্বারে
তাই বুঝি করেছ ধনী ।।

সেজেছ সাজ ভালই তর
মরে যদি ডুবতে পার
লালন বলে যদি ফের
দুকূল হবে অপমানি।। ৯৮

লালনীয় ঘরানার ফকিরী বিশ্বাসের একটা মূল উপাদানই হচ্ছে সন্তান জন্ম না দেওয়া। তাতে আত্মা খন্ডিত হয়। একজন মানুষ তাহলে বিরামহীন পুনঃজন্মের শিকার হয়ে পড়বে। আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিতে আত্মাকে ফের চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে আসতে হবে। লালনের মতে আত্মাকে আবারও পুনঃজন্মের বিরামহীন চক্রে ফেলে দেওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না। ফলে এই মাবজীবন পাওয়া বা মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়াটা লালনীয় বিশ্বাসে তাই এক মহা ভাগ্যের ব্যাপার।

ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব, যা মূলতঃ সেমিটিক পুরাণগুলি থেকে নেওয়া, বিশ্বাস করে যে সব ফেরেশতারাই মাটির তৈরী আদমকে সেজদা দিয়েছিল কেবল ইবলিশ ছাড়া। তাই ইবলিশ হয়ে উঠল শয়তান যার কাজই হচ্ছে মানবজাতিকে ধ্বংস করা। লালনের মতে স্রষ্টা মানুষকে গড়েছেন তাঁর নিজের আদলে। মানুষের দেহের ভেতরেই খোদার বাস। আল্লাহ আর আদম এক না হলে মানুষকে সেজদা দেয়া গোনাহ্ হোত ;

'আপন ছুরতে আদম গঠলেন দয়াময়।
তা নইলে কি ফেরেসারে সেজদা দিতে কয়।।

আল্লা আদম না হইলে
পাপ হইত সেজদা দিলে
শেরেকী পাপ যারে বলে
এ দীন দুনিয়ায়।।' ৯৯

মানুষকে যে উপাসনা করতে অস্বীকৃতি জানায় সে খোদ সৃষ্টিকর্তারই বিরোধী, এই বিশ্বাসটি হয়তো পশ্চিম এশিয়ার সুফিদের দ্বারা ধারিত ও বাহিত হয়ে বাংলার সাধকদের কাছে পৌঁছেছিল। লালন গাইছেন;

'জানতে হয় আদম ছফির আদ্য কথা
না জেনে আজাজিল সেরূপ
কীরূপ আদম গঠলেন সেথা।।

আনিয়ে জেদ্দার মাটি
গঠলেন বোরখা পরিপাটি
মিথ্যা নয় সে কথা খাঁটি
কোন্ চিজে তার গঠলেন আত্মা।।
সেই না আদমের ধড়ে
অনন্ত কুঠুরী গড়ে
মাঝখানে হাতনে কল জুড়ে
কীর্তিকর্মা বসলেন সেথা।।

আদমি হইলে আদম চেনে
ঠিক নামায় সে দেল-কোরানে।।' ১০০

সুফিরা, এবং বাউল-ফকিরেরাও, দয়ালু এক ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির মাঝে প্রেমময় এক সম্পর্কের কথা বিশ্বাস করে এসেছেন। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই নমনীয় ও প্রেমময় সম্পর্কের ব্যাপারটি, ইহুদী ও ইসলামী ঐতিহ্যে যে সর্বশক্তিমান ও শাস্তিদাতা ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই, এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর যে কঠিন পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কের ব্যাপারটি দেখি, তা থেকে পুরোপুরিই আলাদা। একজন ক্ষমতাধর পিতৃতান্ত্রিক শাসকের বদলে প্রেমময় একজন ঈশ্বরের এই যে ধারণাটি লালন ও তাঁর অনুসারী বাংলার বাউল-ফকিরেরা বিশ্বাস করে এসেছেন তা নিঃসন্দেহে সুফি ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

নিজের-ভেতরে-দেখ, সুফি সাধক মনসুর হাল্লাজের সেই বহুলউদ্ধৃত কথাটি তআয়নাল হকদ (তআমিই সত্যদ) লালনেরও অজানা ছিল না;

'মনসুর হাল্লাজ ফকির সে তো
বলেছিল আমি সত্য
সই পলো সাঁইর আইন মতো
শরায় কী তার মর্ম পায়।' ১০১

কোরানের মতে খোদা নিজে অলক্ষ্যে থাকেন এবং দুষ্টকে দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পয়গম্বরদের পাঠান। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাস করা হয়েছে স্রষ্টা নিজেই নানা অবতার হিসেবে আবির্ভূত হন। লালনের মতে, মুহম্মদ (সঃ) স্রষ্টারই এক অবতার;

'কায়ার শরীর ছায়া দেখি
ছায়াহীন সে লা-শরিকী
ফকির লালন বলে তার হাকিকি
বলিতে ডরাই
মদিনায় রসুল নামে
কে এল রে ভাই।' ১০২

লালন নিজেই সে প্রশ্নের জবাবও দিচ্ছেন;

'রসুলকে চিনলে পরে খোদা চেনা যায়।' ১০৩

অবতারবাদে এই বিশ্বাস লালনের বিশ্বাসের জগতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। লালনের কাছে শ্রীচৈতন্য যেমন শ্রীকৃষ্ণের অবতার রসুলও তেমনি স্রষ্টার অবতার।

সুফিরা যেমন শব্দ নিয়ে রহস্য করতে পছন্দ করতেন লালনও তেমনি। তআহাদদ ও তআহমদদ এই দুটো শব্দ নিয়ে লালনের খেলার মাঝে লুকিয়ে আছে এক সুগভীর তত্ত্বকথা;

'কে পারে মক্করউল্লার মক্কর বুঝিতে
আহাদ আহম্মদ নাম হয় জগতে।।
আহাম্মদ নামে খোদায়
মিম হরফে নফি সে হয়
মিম উঠায়ে দেখ সবায়
কী হয় তাতে।।' ১০৪

লালন আরো বলছেন;

'আকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা।
আহাদ আহাম্মদের বিচার হলে যায় জানা।।
খুদিতে বান্দার দেহে
খোদা সে লুকায়ে
আলেফে মিম বসায়ে
আহাম্মদ নাম হো'ল সে জনা।।'১০৫

লালনের বিশ্বাসের জগতে তাই ঈশ্বর-রসুল-আদম এই ত্রিত্ব একাকার। তাঁদের কোনো পৃথক সত্ত্বা নেই;

'আলিফে আল্লাহ
মিমে মহম্মদ
দমে আদম।'

এই তিনের সাথে একাত্ম হয়ে স্রষ্টা মানবদেহে লীলা করেন। বিশ্বাসের এই জগতের কোন্ বর্ণমালার কোন্ বর্ণের প্রকৃত অর্থ কী তা' বুঝতে হলে সাধনার তরীকায় দাখিল হতে হয় এবং গুরু বা মুরশিদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয়। আর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে কেবল মাত্র তখনই সম্ভব হবে পুনঃজন্মের যন্ত্রণাটা এড়ানো !

ওয়াহাবী ধারণায় জেহাদটা হচ্ছে বাইরের শক্তির সঙ্গে। আর প্রেম-ভালোবাসায় অভিষিক্ত সুফিদের ক্ষেত্রে লড়াইটা হচ্ছে মানুষের মনের ভেতরের শত্রুর সঙ্গে। মানবপ্রকৃতির চিরন্তন সেই মন্দ প্রবণতাগুলোর বিরুদ্ধে। ইসলামী ধারণার একটি মাত্র ইবলিশ বা শয়তানের পরিবর্তে, লালনের পরিভাষায়, মানুষের অন্তর্নিহিত ছয়টি রিপুই হচ্ছে মানুষের চরম শত্রু। রিপুগুলো হচ্ছে লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, মোহ, অহংকার ও নিষিদ্ধ যৌনকামনা, যেগুলি মানুষের মানবিক সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। লালনের গানে, কখনো গভীরতায়, কখনো হালকা কৌতুকে, মানুষের সঙ্গে ওই নাছোড়বান্দা ছয়টি রিপুর নানা দ্বন্দ্বের উল্লেখ বারে বারেই তাই দেখতে পাই আমরা।

গুরুকে লালন-অনুসারীদের 'সাঁই' বা 'সাঁইজী' নামে ডাকার যে রীতি তা বৈষ্ণবীয় 'স্বামী'-র (কর্তা) অথবা সুফি শব্দ 'শাহ্' উভয়েরই অপভ্রংশ হতে পারে। তবে গুরু সম্পর্কে লালনের ধারণাটি সুফি ঘরানার মুরশিদ ধারণাটারই যেন বেশী কাছাকাছি। মধ্যপ্রাচ্যের সুফিদের কাছে যা 'শায়েখ', বাংলার লালনপন্থীদের কাছে তা 'মুরশিদে'-য়ে রূপান্তরিত হয়েছে। গুরু বা মুরশিদ, যাঁরা এই আত্মানুসন্ধানী নিগূঢ় যৌন সাধন-প্রক্রিয়াটা শেখাবেন, তাঁদের গুরুত্বটা সর্বোচ্চ ;

'গুরু তুমি পতিতপাবন পরমেশ্বর
অখন্ড মন্ডলকারম
ব্যাপ্তং জগৎ চরাচর।'১০৬

ওঁর গানগুলিতে লালন প্রায়ই উল্লেখ করেছেন যে ওঁর নিজের গুরু ছিলেন 'দরবেশ সিরাজ সাঁই।' 'দরবেশ' শব্দটিই সুফি ঘরানার ইঙ্গিতবাহী। তবে ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ, ছেঁউড়িয়ার একজন প্রখ্যাত লালন অনুসারী, যিনিই প্রথম লালনের গানগুলি তিন খন্ডে প্রকাশ করেছিলেন এবং লালনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সবচে বেশী জানতেন, আমাকে জানিয়েছিলেন যে তদরবেশ সিরাজ সাঁইদ কোনো বাস্তবের চরিত্র নন। ফকির আনোয়ার শাহ্র মতে, তসিরাজদ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপাধির একটি। লালন যেহেতু একটি গুরুবাদী মানবধর্ম প্রচার করেছেন, ফলে ওঁরও একজন মানবগুরুর প্রয়োজন ছিল। ফলে ওঁর সেই কল্পিত গুরুর নাম হিসেবে উনি সকল কিছুর স্রষ্টা খোদার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তসিরাজদ নামটি বেছে নিয়েছিলেন। লালনের গুরু সিরাজ সাঁই তাই আর কেউ নন, মানব নামধারী স্বয়ং ঈশ্বর।

লালনের সাধন-প্রক্রিয়ায় সর্বদাই মুরশিদ বা গুরু হচ্ছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশক্তিমান;

'মুরশিদ বিনে কী ধন আর আছে রে মন এ জগতে
যে নাম স্মরণে মন রে, তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে জপ ওই নাম দিবারাতে ।।
মুরশিদের চরণের সুধা, পান করিলে যাবে ক্ষুধা
কর না রে মন দেলে দ্বিধা, যেহি মুরশিদ সেহি খোদা
ভজ ওলিয়েম মুরশিদা আয়াত লেখা কোরানেতে ।।
আপনি আল্লা আপনি নবি, আপনি হন আদম সফি
অনন্ত রূপ করে ধারণ, কে বোঝে তাঁর লীলার করণ।।'

এক পর্যায়ে তাই আল্লাহ-মুরশিদ-গুরু সব সমার্থক হয়ে পড়ে। লালন ফকির, যদিও নিজেও একজন গুরু ছিলেন, কিন্তু উন্নত সংবেদনশীলতা ও অসাধারণ নম্রতার অধিকারী হওয়ার কারণে, নিজেকে কখনোই ও ধরণের কোনো উঁচু বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেননি। আসলে সব কিছুর উপরে লালন ফকির ছিলেন একজন সৃজনশীল শিল্পী, একজন নিপুণ সঙ্গীত-রচয়িতা। শাস্ত্র নয়, আশ্রম নয়, ওঁর প্রধান অস্ত্র ছিল ওঁর গান।১০৮ ৭৮ এবং ওঁর জীবনদর্শন উনি ওঁর ওই প্রহেলিকাময় গানগুলির মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেছেন। সমস্ত বিনয় নিয়েই উনি জীবনের শেষ পর্যন্তও রয়ে গেছেন একজন সৃজনশীল শিল্পী ও একজন গীতিকার। ওঁর গোটা দীর্ঘ জীবনে, এমন কী মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগ মুহূর্ত পর্যন্তও, লালন ফকির গান রচনা করে গেছেন। এ পর্যন্ত লালনের সাড়ে পাঁচশ গানের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আরো কিছু গান সাক্ষরতাহীন বাউল-ফকিরদের মৌখিক সাঙ্গীতিক ধারার মাঝে হয়তো এখনও রয়ে গেছে যা আজও তালিকাভুক্ত হয়নি।

লালন ছিলেন, যা তাঁর মনোমুগ্ধকর গানগুলিতে বারেবারেই প্রমাণিত, একজন গভীরমনস্ক শিল্পী ও অত্যন্ত সুদক্ষ এক সঙ্গীতরচয়িতা। ওঁর নিজের সাধনা ছিল নিগূঢ় এবং ওঁর গানগুলি, সঙ্গীত শিল্পের যে কোনো মাপেই, খুবই উন্নত মানের। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, পরবর্তীকালে লালন ফকির যখন সমাজের উঁচু মহলে বিখ্যাত হতে শুরু করলেন এবং সংস্কৃতি-বাণিজ্যে অপরিহার্য্য হয়ে উঠতে থাকলেন, তখন অনেক পল্লীগায়কই ত্বাউলদ শব্দটির প্রকৃত অর্থ না জেনেই, অথবা যাদের মাঝে সাধনার কোনো বালাই নেই, নিজেদেরকে লালন-অনুসারী 'বাউল' হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), যাঁর জমিদারীর এলাকা শিলাইদহের অন্তর্ভূক্ত ছেঁউড়িয়ায় লালন ফকির বসবাস করতেন, লালনের গানের আধ্যাত্মিক গভীরতায় ব্যাপকভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লালনের কয়েকটি গান প্রকাশ করেছিলেন এবং বাঙ্গালি শিক্ষিত সমাজে লালনের কাজকে পরিচিত করিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লালন ফকির ও সামগ্রিকভাবে বাউলদের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে উনি নিজেও বাউলদের মত পোশাক পরা শুরু করেন এবং নিজেকে বলতেনও ত্বরবীন্দ্র বাউলদ। এখন এই যে রাবীন্দ্রিক ধারণার বাউল, বায়বীয় চেতনার দাড়িওয়ালা একজন মানুষ, যার কোনো বৈষয়িক চিন্তা নেই এবং যে কেবল একতারা হাতে কোনো তঅচিন মানুষদ-কে খুঁজে ফিরছে, এটা যতটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশী নির্মাণ। তবে যুগ যুগ ধরে বাউলদের এই রূপটা নাগরিক শ্রেণীগুলির কল্পলোককে আলোড়িত করেছে। এবং দুঃখজনকভাবে, লালন ফকিরও ওরকম একজন বায়বীয় বাউলের প্রতিরূপ হয়ে উঠলেন যেটা প্রকৃত মানুষটি ও তাঁর আসল ব্যক্তিসত্তার চেয়ে অনেকটাই বাঙ্গালি মধ্যবিত্তের এক রোমান্টিক নির্মাণ।

লালন ফকির মোটেই কোনো ভাববাদী আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন না। বরং লালনের গানগুলির মর্মার্থ পাঠ করলে বোঝা যায় ওঁর ধারণাগুলো কতটা বস্তুবাদী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানবিরোধী ও অন্তর্ঘাতমূলক ছিল। তাই এটা আশ্চর্যের নয় যে কেন লালনকে এত হেঁয়ালিপূর্ণ ও রূপকভাষায় ওঁর গানগুলি রচনা করতে হয়েছিল। বর্ণবাদী হিন্দুসমাজ ও শরীয়তী ইসলামপন্থীদের কাছে লালনের ধ্যান-ধারণাগুলো ছিল অতিরিক্ত ধ্বংসাত্মক, যা কেবল প্রচার নয়, ওদের পক্ষে সহ্য করাও ছিল কঠিন। ফলে দেখি লালন কেবল ব্রাহ্মণীয় ত্বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকারদ দ্বারা শঙ্কিত ছিলেন না, তাঁকে ওয়াহাবী ধর্মান্ধদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হয়েছে, যাঁদের কাছে ওঁর ঈশ্বর-মানবদেহে-বাস-করেন কিম্বা আল্লা-মুহাম্মদ-আদম সমার্থক, এসব বক্তব্য ছিল সহ্যের অতীত। তাই এটা আশ্চর্য্য করে না যে বাউলদের বিরুদ্ধে গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন সময়ে ত্বাউল ধ্বংস ফতোয়াদ জারী করা হয়েছিল।

কেবল যখন মধ্যবিত্ত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা লালনের গানগুলি ভাববাদী রসে আচ্ছন্ন হয়ে এবং সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ছাড়াই উপস্থিত হওয়া শুরু হোল কেবল তখনই শরীয়তপন্থী ধর্মীয় শক্তি, মাঝে-মাঝে ক্ষোভপ্রকাশসহ, এটা মেনে নিল। তবে গ্রামীণ মোল্লা ও লালনপন্থী ফকিরদের মাঝে বৈরীতা এখনও বিরাজমান যা আমি আমার তঅচিন পাখীদ প্রামাণ্যচিত্রটির গবেষণার কাজে ফকির মহিন শাহ্ সঙ্গে কুষ্টিয়ার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর সময় অনেকবারই উপলব্ধি করেছি। বাংলাদেশের নিভৃত গ্রামাঞ্চলে লালনপন্থী বাউল-ফকিরেরা আজো নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়েও, ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে যখন লালন ফকিরের আদলে গড়া একটা বাউল মূর্তি ইসলামী মৌলবাদীরা শক্তি প্রদর্শন করে উপড়ে ফেলল, তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রশক্তি পরাজয় মেনে নিল এবং মূর্তিটা পুনঃস্থাপনের কোনো সাহসই আর দেখায়নি।

লালনের গানের আপাত সহজ প্রতীক ও রূপকগুলিও - তঅচিন পাখীদ, 'মৎস্য', 'চাঁদ', 'পুকুর', 'নদী', এসবই নানা যৌন সাধন-প্রক্রিয়ার অর্থবহ। লালন ফকিরের গানের প্রকৃত মানে এবং লালন-ঘরানার ফকিরদের দেহকেন্দ্রিক সাধনপ্রক্রিয়াটা বাঙ্গালি ভদ্র শ্রেণীগুলির সংবেদনশীলতার পক্ষে ঘৃণ্য বোধ হতে বাধ্য। ফকির

মহিন শাহ্ আমাকে বলেছিলেন যে বাউল-ফকিরদের প্রধান রক্ষাকবচ হচ্ছে যে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা লালনের গানের প্রকৃত অর্থ তেমন জানে না। এই তরিকার বাইরের মানুষেরা এসব গানের অন্তর্ঘাতমূলক বাণীর কিছুই না বুঝে গানগুলোর কাব্যগুণের সৌন্দর্য্যেই কেবল মুগ্ধ হয়ে পড়ে। এটা ইতিহাসের এক পরিহাস যে লালনের গানগুলি আজ প্রেমের গান কিংবা নাগরিক উচ্চবিত্তদের জন্যে আধ্যাত্মিক পলায়নী প্রবণতার গান হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যা এসব গানের মূল উদ্দেশ্য কখনোই ছিল না!

এক নমনীয় ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার ব্যক্তিগত এক সম্পর্কের অন্বেষা, যা সুফি মতবাদের কাছাকাছি এবং ওয়াহাবী ইসলামের পুরোপুরি পরিপন্থী, সেটাই লালন ও বাংলার আধ্যাত্মিক সাধকেরা চর্চা করে এসেছেন। লালনের অনেক গানেই ব্যক্ত হয়েছে এই আকুতি। আমরা জানি যে সুফি বিশ্বাসে বিনয় ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার বিষয়টি কত বড়ভাবে বিদ্যমান। লালনের গানগুলোতেও বিনয় ও এক 'অচেনা পড়শী'-র জন্যে আকুতিটা দেখি চিরন্তন;

বাড়ির কাছে আরশিনগর ১০৯
সেথা এক পড়শি বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।।

গিরাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে
মনে বাঞ্ছা করি দেখব তারে
কমনে ১১০ সে গাঁয় যাই রে।।

পড়শি যদি আমায় ছুঁতো
যম যাতনা সকল যেত দূরে
সে আর লালন একখানে রয়
মাঝে লক্ষ যোজন ফাঁক রে।।' ১১১

ইদানীং অবশ্য বাউলদের ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ মধ্যবিত্তদের অতিরিক্ত আগ্রহের কারণে জাতীয়তাবাদী আলোচনার বয়ানগুলিতে দেখি লালনের ত্বাউলদ উপাদানগুলিকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং লালন ফকিরের উপর ত্ফকিরীদ বা সুফি প্রভাবকে হয় পুরোপুরি অবহেলা অথবা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

(ক্রমশ)

তাঁর সমন্বয় সাধনা পাঠককে প্রাণীত করবে

মিলন দত্ত

আবুল হাসনাতের লেখালিখির সঙ্গে আমার পরিচয় অতিসম্প্রতি; তাঁর কয়েকটি বইয়ের মধ্যে দিয়ে। এটা আমার জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এতটা বিলম্বের কারণে। তাঁকে জানতাম; ইংরেজির নামি অধ্যাপক এবং সুপণ্ডিত হিসেবে। সম্প্রতি প্রাপ্ত তাঁর তিনটি বই নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি। বইগুলো পড়তে পড়তে আবুল হাসনাতের পাণ্ডিত্যের বাপ্তি ও গভীরতা একটু একটু করে ধরা দিতে থাকে। ১৯৮৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত তাঁর কিছু লেখালিখি নিয়ে তৈরি হয়েছে তিনটি বই।

তিনি দারা শিকোহ সমন্বয়-চিন্তা, বিদ্যাসাগরের কবিত্ব, রামমোহনের ফারসি গ্রন্থ 'তুহফাৎ উল মুহহিদিন' কিংবা বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা বিষয়ে যে তথ্য ও উপাত্ত হাজির করে পাঠককে এক অনন্য সমন্বয়ী ভাবনায় উপনীত করেন। বিশ্বভারতী পরিষদে ১৩৩২ সনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করতেই হয়, 'মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ করে আপনার করে অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন করে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো করে আপনার করে, দারাশিকো একদিন যেমন করে বুঝেছিলেন, অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এই রকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোছে।' এটাই সম্পূর্ণ করে জানতে চেয়েছেন নিষ্ঠ রবীন্দ্রনুরাগী আবুল হাসনাত। যেন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বাণীকেই তাঁর কাজের মধ্যে রূপ দিয়ে চেয়ে চলেছেন তিনি। আবুল হাসনাত যেমন সহজ করে দারাশিকোহকে চিনিয়েছেন তেমনই রামমোহনকে। এ যেন সমন্বয়ের কোনও সঙ্গমে তিনি অবগাহণ করছেন। তাঁর কথাতেই আমরা দারাশিকোহর সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে নিই, 'দারার কাল ছিল রাজনৈতিক ঝড়ে বিক্ষুব্ধ। দিল্লির সিংহাসনের কুটিল হাতছানি। আর সব ভাইয়ের মতো দারাও এই হাতছানিকে প্রথম প্রথম উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে। কিন্তু সে সব তিনি অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর অন্তরে ছিল এক বিপুল আধ্যাত্মিক ক্ষুধা। দুটি প্রবল চিন্তার আলোড়ন তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল।খ দারা নিজে সংস্কৃত শিখলেন এবংখ তাঁর প্রিয় গ্রন্থ উপনিষদের বেশ কিছুটা অংশ ফারসিতে অনুবাদ করলেন।' লেখক দেখিয়েছেন যে, কোরান এবং ইসলাম থেকে আর ফারসি সুফি কবিদের রচনা থেকে তিনি যে এক ঈশ্বরের ধারণা লাভ করেছিলেন সেই ঈশ্বর ছিল প্রধানত ইমানেন্ট বা মর্ত্যমুখীন। দারা শিকোহর একাধারে কোরান ও

উপনিষদ অধিগত করে তা প্রকাশ করারে লেখক বলেছেন 'দুই সমুদ্রের মিলন'।

রামমোহন রায়ের ইমানেন্ট বা মর্ত্যমুখীন ঈশ্বর ভাবনার উৎস তিনি সন্ধান করেছেন উপনিষদ, কোরান আর ফারসি কাব্য চর্চার মধ্যে। লেখক বলছেন, বিদ্যাসাগরের মতো ট্রানসেনডেন্ট রা অতিন্দ্রীয়বাদকে একেবারে বিসর্জন করতে পারেননি কিন্তু রামমোহনের ইমানেন্ট বা মর্ত্যমুখীন ভাবনার পরিচয় মেলে সতীদাহ প্রথা রদ এবং ইংরেজি চর্চার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোকায়ন বৃত্তে প্রবেশে। 'ইমানেন্ট ভাবনার আর একটি পরিচয় ফারসি সাহিত্যে তাঁর গভীর আসক্তি।খ সাদি হাফেজ রুমির কাব্যে তিনি উদার ধর্মবোধ এবং সম্প্রদায় নিরপেক্ষ মানুষের পরিচয় লাভ করেছেন', রামমোহনকে নিয়ে এ তাঁর পর্যবেক্ষণ। 'কালের প্রহরী'তে একটা প্রবন্ধ আছে রামমোহন রচিত ফারসি গ্রন্থ 'তুহফাৎ উল মুহহিদিন' নিয়ে। আবুল হাসনাত দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন রচিত এই গ্রন্থ 'রামমোহনের মমন চর্চার অমৃতময় ফল'। একই গ্রন্থে আরেকটি অমূল্য রচনা 'বিদ্যসাগরের কবিত্ব ভাবে ও ভাবনায়'। বিদ্যাসাগরকে কবি বলেছেন আবুল হাসনাত। কেন কবি? তাঁর ব্যাখ্যা, 'খযাঁরা বিপ্লবের জনক তাঁরা সবাই কবি।খ আমাদের বিদ্যাসাগরও একজন কবি। তিনি জেগে উঠতে থাকা এক যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের নিদ্রামুক্তির বিশ্বস্ত অগ্রদূত (বিপন্ন অগ্রদূতও কি?)। আর এই মুক্তি-আন্দোলনের তিনি শরিক ও অনুসারী। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একদিকে ভাবনা, অপরদিকে প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থায় (system) কিছু স্থয়ী পরিবর্তন। যার শেষ লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। এটাই তো কবির কাজ।' বিদ্যসাগর সম্বন্ধে তাঁর আরও মত, 'একদিকে মনুষ্যত্বের অনন্ত সম্ভাবনাকে চূর্ণ করে প্রাচীন শাস্ত্রের বিজয়রথের নির্ঘোষ, অপরদিকে বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তির আলোকে মানবতার অভ্রভেদী অভিযান। স্বাভাবতই বিদ্যাসাগর মানুষ এবং মনুষ্যত্বের পক্ষেই তাঁর আত্মনিবেদনকে সচল রেখেছিলেন। তিনি সাংখ্যবেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেনখ ঈশ্বর সম্পর্কে নিরুত্তর এবং নিরুত্তাপ। মানবমুখী দর্শনেই আত্মনিবেদিত। বিদ্যাসাগর করুণারও সাগর। তাঁর কালের সার্থক প্রহরী; জাগ্রত বিবেক।'

'মৃত্যুর চার বছর পূর্বে, ১৮৯৮ সালে বিবেকানন্দ নৈনিতালের সরফরাজ হোসেনকে লিখেছিলেন, যে নবীন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেন, সেখানে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম দুই মহান মতের সমন্বয় প্রয়োজন। এই সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন সেই সেই বিখ্যাত কথা বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ।... ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজি প্রসঙ্গে একাধিকবার ইসলামিক হার্ট-এর কথা বলতে চেয়েছেন।' 'বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা একটি ঐতিহাসিক পত্র' প্রবন্ধে জানাচ্ছেল আবুল হাসনাত। পারসিক সুফি কবি সাদি হাফেজ রুমির কাব্যেও বিভোর ছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' উক্তির মধ্যে যে প্রেম ব্যক্ত হয়েছে তা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর একটা পথ বলে মনে করছেন লেখক। সুফি দর্শনের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রেম-ভাবনা এবং সেবা-ধর্মের মিল খুঁজে পেয়েছেন আবুল হাসনাত।

আবুল হাসনাতের যাবতীয় কাজের মধ্যে দেখতে পাই সমন্বয়ের ব্যকুলতা। আবার একই সঙ্গে সমকালে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি নিয়ে তাঁর শঙ্কা এবং উদ্বেগ। তিনটি বইয়ের নানা লেখার মধ্যে তাঁর এই সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক দায় বোধ স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁরই সম্পাদিক পত্রিকা 'জঙ্গম'-এ বিভিন্ন লেখায় তিনি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের কথা বলছেন বারবার। সেটা ১৯৮৮ সাল। পড়তে পড়তে মনে হবে, তাঁর কথাগুলো যেন বলা হয়েছে গত এক বা দুই দশকে দেশে সরকারের সাম্প্রদায়িক অবস্থান বিবেচনা করে সমাজ ও সরকারের প্রতি জোরালো চেতাবনি। লিখছেন, 'আমাদের দেশে ধর্মভিত্তিক জাতিত্বকে শক্তিশালী করার একটা ব্যাপক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।খ ধর্ম হিসেবে কোন সম্প্রদায় বড় এই চিন্তা ও তার প্রকাশে অসুস্থ প্রতিযোগিতা সমগ্র দেশের পক্ষে অশুভ লক্ষ্মণ।' তাঁর সমন্বয়ী ভাবনার প্রতিফলন দেখি যাবতীয় লেখালিখির মধ্যে। ওই লেখাতেই (হিন্দু মুসলিম নয়, ভারতীয় জাতি) পাই, 'ভারতীয় জাতির কয়েক শত বৎসরের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে, হিন্দুর ভাবনার মধ্যে মুসলমানের চিন্তাপ্রবাহ, এবং মুসলমানের জীবনযাপনের মধ্যে হিন্দুর চিন্তাপ্রবাহ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। তাদের বর্ণশঙ্কর ঘটে গেছে।' এ কথাটা এত সহজ আর স্পষ্ট করে এর আগে বোধহয় কেবল রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন।

আবুল হাসনাত যেন কাজী আবদুল ওদুদের উত্তরসাধক। তাঁর লেখালিখির ভিতর দিয়ে সমন্বয় প্রচেষ্টা আর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমাবনতি নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে যেন ওদুদকে দেখতে পাই। তাছাড়া পণ্ডিতপ্রবর রেজাউল করিমের ছায়ায় তাঁর বড় হয়ে ওঠা; তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। রেজাউল করিম ছিলেন তাঁর আপন চাচা। 'রেজাউল করিমকে যেমন জেনেছি' নিবন্ধ (ইতস্তত) অতি সংক্ষিপ্ত হলেও প্রায় গোটা মানুষটাকে চিনে নিতে পারি। তিনটি বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে ফারসি সাহিত্য বিশেষত ফারসি কবি ও কবিতা নিয়ে তাঁর গভীর ভালবাসা আর জ্ঞানের চিহ্ন ছড়িয়ে

রয়েছে। আমাদের মতো অর্বাচিনের পক্ষে তার পুরোটা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তাঁর লেখালিখিতে ফারসি কবি ও কবিতার অনায়াস গতায়াত বিস্মিত মুগ্ধ করে। মুগ্ধতা কেবল নতুন কিছু জানতে পারছি বলে নয়, দুটি প্রান্তকে বিনা আয়াসে যুক্তিসঙ্গত এবং অর্থবহভাবে জুড়ে দেওয়ার দক্ষতায়। আবারও এর ভিতর দিয়ে তিনি বারংবার বাংলা-ফারসি কেবল নয় হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনার ধারাটিকে ধারণ করেছেন। 'রবীন্দ্র কবিতার ফারসি অনুবাদ', 'ডিরোজিওর ফারসি কাব্য-চর্চা' বা 'ইন্দো-ফারসি সাহিত্যে রামায়ণের কাহিনি' তার সামান্য কিছু নমুনা। 'চিত্তে চিত্তে অন্তহীন' গ্রন্থে নূর লাইব্রেরি এবং তার বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ে যে সন্দর্ভটি সংকলিত হয়েছে সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি গবেষণাপত্র। লেখাটিতে বাংলা প্রকাশনার স্বর্ণযুগের একটি বিস্মৃত সময়কাল ধরা রয়েছে। এ বইয়েও সংস্কৃত চর্চায় মুলিম সাধনা প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন দারা সিকোয়। তিনি সংস্কৃত শিখে ফরাসি ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করছিলেন। লিখেছিলেন 'মাজমা উল বাহরায়েন' (দুই সমুদ্রের মিলন) নামের গ্রন্থ; বেদান্ত এবং সুফি ভাবনার মিলন।

আগেও বলেছি আবুল হাসনাত বার ফিরে যান তাঁর সমন্বয় সাধনায়। তাঁর যাবতীয় উচ্চারণে কেবলই ধ্বনিত হয় সমস্বয় প্রচেষ্টা। তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করে আজকের দেশজোড়া বিদ্বেষের বাতাবরণ। নিষ্ঠ পাঠক বইগুলো পাঠ করতে করতে লেখকের সমন্বয় ভাবনার অনুযাত্রীক হয়ে উঠবেন, এ আমার বিশ্বাস।

ইতস্তত। আবুল হাসনাত। ছাপাখানার গলি। জানুয়ারি ২০১৩

চিত্তে চিত্তে অন্তহীন। আবুল হাসনাত। রবিপ্রকাশ। ডিসেম্বর ২০২১

কালের প্রহরী। আবুল হাসনাত। উদার আকাশ। জানুয়ারি ২০২৪

মন্দির-মসজিদের রাজনীতি: হিন্দি বলয় থেকে বাংলায়

মজিবুর রহমান

বিশিষ্ট মারাঠি রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক গোপাল কৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫) বলেছিলেন, 'বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত ভাবে আগামীকাল।' বাঙালি জাতির প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনা ও প্রগতিশীল ধারণার প্রশংসা করতেই মহামতি গোখলে এই মন্তব্য করেছিলেন বলে মনে করা হয়। গোখলের মন্তব্যের পর শতবর্ষের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ব্রিটিশ পরাধীন ভারত স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে পরিণত হয়েছে। বঙ্গ প্রদেশের অর্ধেকের কম অংশ নিয়ে সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য। এই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'এগিয়ে বাংলা' হলেও বাস্তবে অনেক ব্যাপারেই পিছিয়ে পড়ছে। পশ্চাৎপদতার নমুনা হিসেবে অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গকে উত্তর প্রদেশ থেকে মন্দির-মসজিদের রাজনীতি আমদানি করতে দেখা যাচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসকরা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি'র অংশ হিসেবে ভারতের জনগণকে হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত করেন। ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের উদ্ভবের কাহিনি ও উপাসনা পদ্ধতি অনেকটাই আলাদা। ধর্মীয় প্রভেদ ও পারিপার্শ্বিক পার্থক্যের কারণে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা মানসিক দূরত্ব রয়েছে।এতে ইংরেজদের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী জনগোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরা সহজ হয়েছে। এর ফলে এই দুই জনগোষ্ঠী যেমন প্রয়োজনে একসাথে পথ চলেছে তেমন পৃথক ভাবেও দলবদ্ধ হতে চেয়েছে। ফলস্বরূপ, হিন্দুপন্থী ও মুসলিমপন্থী সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনকষাকষি হতে দেখা গিয়েছে। তবে উপাসনালয় নিয়ে বিতর্ক তৈরিতে এক নম্বরে থেকেছে উত্তর প্রদেশ।

মধ্য এশিয়ার ফারগানা প্রদেশের রাজপরিবারের সদস্য মির্জা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০) ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, বাবর ও লোদি দুজনেই মুসলমান ছিলেন। সে সময় শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় উপাসনালয় ভাঙ্গা-গড়ার একটা রীতি ছিল। প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক কারণে ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্মের শাসকরাই মন্দির-মসজিদ ভেঙেছেন অথবা নির্মাণে মদদ দিয়েছেন। ১৫২৮ সালে সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাকি অযোধ্যায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা সম্রাটের নামানুসারে বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত হয়। নির্মাণের সাড়ে তিনশো বছর পর মসজিদটি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের ওপর তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। কিন্তু উপমহাদেশের কোনো সাহিত্য, ইতিহাস কিংবা সরকারি দলিল দস্তাবেজে রামজন্মভূমিতে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করার কোনো ইঙ্গিত বা উল্লেখ নেই। যেমন, সম্রাট বাবরের সমসাময়িক কবি তুলসী দাস গোস্বামী (১৫১১-১৬২৩) 'রামচরিতমানস' সহ ডজনখানেক পুস্তকের কোথাও বাবরি মসজিদের জায়গায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ করার অথবা রামমন্দির

থাকার কথা লেখেননি। উল্লেখ্য, শ্রীরামচন্দ্র রক্তমাংসের কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন। তিনি একটি কাল্পনিক চরিত্র। বাস্তবে তাঁর কোনো জন্মদিন ও জন্মস্থান থাকা সম্ভব নয়। ঈশ্বর-অবতারতত্ত্ব মূলত ভক্তি-বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ধর্মীয় ভক্তি-বিশ্বাসের কাছে কালে কালে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সত্যকে পরাজয় স্বীকার করতে দেখা যায়। অন্ধভক্তি আর অন্ধবিশ্বাস হেলায় হারিয়ে দেয় অকাট্য যুক্তিকে।

১৮৫৬ সালে আওধের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের (১৮২২-১৮৮৭) আমলে বাবরি মসজিদ থেকে ৬০ ফুট দূরে রাম পুজো করার জন্য ২১ ফুট দীর্ঘ, ১৭ ফুট চওড়া ও আধ হাত উঁচু একটি অস্থায়ী চতুবরা বা চাতাল তৈরির মধ্য দিয়ে অযোধ্যায় মন্দির-মসজিদ বিতর্কের সূচনা হয়। এই দীর্ঘমেয়াদি বিতর্কের ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর মন্দিরপন্থীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপর ৫.৮.২০২০ তারিখ রামমন্দিরের শিলান্যাস এবং ২২.১.২০২৪ তারিখ তার উদ্বোধন করেন। ১৯৯০-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত রামমন্দির আন্দোলন মূলত ধর্মীয় আবেগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এরপর বিজেপি এই আন্দোলনকে পুরোপুরি রাজনীতির অঙ্গনে নিয়ে আসে। মন্দির-মসজিদ তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেই বিজেপি এখন দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল তথা শাসকদলে পরিণত হয়েছে। অযোধ্যার বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কের পরিচিত পথেই সম্রাট বাবরের আমলে সম্ভলে হরিহর মন্দির ধ্বংস করে জামে মসজিদ, সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে মথুরায় কেশব দেব মন্দির ভেঙে শাহী ঈদগাহ মসজিদ এবং বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের একাংশ ভেঙে জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে বলে মন্দিরপন্থীরা অভিযোগ করছে। আগামীদিনে এই ধরনের অভিযোগ আরও বাড়বে।

বিজেপি গোটা দেশ জুড়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছড়িয়ে দিতে সফল হলেও মন্দির-মসজিদের কাঠামোগত বিবাদ উত্তর প্রদেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি। বিজেপি'র সেই ব্যর্থতা ঢাকতে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পশ্চিমবঙ্গ উত্তর প্রদেশ থেকে মন্দির-মসজিদের রাজনীতি আমদানি করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে দীঘায় ২০ একর এলাকা জুড়ে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে জগন্নাথ ধাম তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, শিলিগুড়িতে 'মহাকাল মন্দির' আর নিউ টাউনে 'দুর্গাঅঙ্গন' তৈরি করবেন। দেশের সকল মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে তিনিই বোধহয় সর্বাধিক পুজো উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় এমন জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিমা বিসর্জনের কার্নিভাল দেশের অন্য কোথাও হয় না। পুজোৎসবে ক্লাবকে টাকা দেওয়ার ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গ পথিকৃৎ। পুরোহিত ভাতা চালু করা হয়েছে। বিজেপির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিএমসি রাম নবমী উদযাপন করছে। বিজেপি যেমন লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ করে টিএমসি তেমন চণ্ডীপাঠের আসর বসায়। রাজ্যের দুই প্রধান দলের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতিযোগিতা জমে ওঠে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মুসলিম প্রীতি প্রদর্শনে কসুর করেন না। এই ব্রাহ্মণ কন্যা মৌলভী-মাওলানাদের মাঝে মধ্যমণি হয়ে অবস্থান করতে ভালোবাসেন। ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে ইমাম-মোয়াজ্জিনদের ভাতা দিয়ে মুসলমানদের 'দুধেল গাই' বানাতে চান। ইফতারে হিজাব পরিধান, ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ আর ইনশাআল্লাহর অপপ্রয়োগ চালিয়ে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথম মেয়াদেই মুসলিম সমাজের ৯৯ শতাংশ কাজ শেষ করে দেওয়ার দাবি করে রেখেছেন। দশ হাজার মাদ্রাসা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু তাঁর আমলে একটিও সিনিয়র মাদ্রাসা অথবা হাই মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়নি। আইনি জটিলতায় মুসলমানরা এখন সেভাবে ওবিসি সংরক্ষণের সুবিধাও পাচ্ছে না। ওয়াকফ আইন ও আন্দোলনে এরাজ্যে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। মুখে তোষণ আর বাস্তবে বঞ্চনার বিরাম নেই!

বিজেপি'র নেতারা দিনরাত ঘৃণা ভাষণ দিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী, ঘুষপেটিয়া, বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বলে গালমন্দ না করলে তাদের পেটের খাবার হজম হয় না। তারা এরাজ্যে যত্রতত্র রামমন্দিরের শিলান্যাস করছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত একজন মহারাজ রয়েছেন যিনি হিন্দুধর্ম পালন বা প্রচারের চেয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদ ছড়ানোর কাজ বেশি করেন।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বাড়বাড়ন্ত দেখে মুসলিম মৌলবাদ চুপ করে থাকতে পারে না। তাই টিএমসি'র বিধায়ক হুমায়ুন কবির হুমকি দেন মুর্শিদাবাদের ৭০ শতাংশ মুসলমান ৩০ শতাংশ হিন্দুকে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে এই হুমকি মেরুকরণ ঘটাতে সাহায্য করে। ফায়দা তোলে টিএমসি। কংগ্রেস, বিজেপি, টিএমসি, নির্দল-- সাত ঘাটের জল খাওয়া হুমায়ুন কবির এবার বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। কয়েক লাখ মুসলমানের উপস্থিতিতে ৬ ডিসেম্বর'২৫ এই মসজিদের শিলান্যাস করা হয়েছে। মসজিদটির জন্য 'কিউ আর কোড' ও দানবাক্স অর্থসাহায্যে ভরে উঠেছে। মন্দিরের ব্যাপারে যেমন

হিন্দুদের আবেগ উথলে ওঠে মসজিদের ব্যাপারে তেমন মুসলমানরা অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মুসলিম মানসিকতায় মসজিদ পবিত্রতম কাঠামো-- আল্লাহর ঘর। সেই মসজিদ কে কেন নির্মাণ করতে চাইছে মুসলিম সমাজ তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করে না। বেলডাঙ্গার প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রেও প্রাথমিকভাবে সেটাই ঘটেছে। বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, এই মসজিদটি নির্মাণের উদ্দেশ্য যতটা না ধর্মীয় তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক। তাই হুমায়ূন কবির বেলডাঙ্গায় মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক দলও গঠন করছেন। মসজিদের নামকরণে 'বাবরি' ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। ঠিকমতো নামাজ পড়তে না জানা হুমায়ূন কবির 'আল্লাহর ঘর' তৈরির উদ্যোক্তা হয়ে মুসলমানের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার কৌশল নিয়েছেন। অথচ তাঁর জনপ্রতিনিধি হিসেবে অথবা ব্যক্তিগত পরিসরে মুসলিম সমাজের উন্নয়নে কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করার রেকর্ড নেই। হঠাৎ তিনি মুসলমানদের 'মেসিহা' সাজতে চাইছেন! যে ব্যক্তির বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক সততা নেই, ধর্মীয় জ্ঞান নেই তার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রবল সমর্থন বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ শেষ পর্যন্ত তৈরি হবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক একর জমি দরকার। অথচ এখনও পর্যন্ত মাত্র তিন কাঠা জমি নিশ্চিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জমির মালিকরা তাদের জমি মসজিদের জন্য দান অথবা বিক্রি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। শিলান্যাসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুজন ব্যক্তিকে সৌদি আরবের মাওলানা হিসেবে পরিচিত করা হয়। পরে জানা যায় তারা পশ্চিমবঙ্গেরই লোক। হুমায়ূন কবিরের বেসরকারি দেহরক্ষী হিসেবে আসা 'হায়দ্রাবাদী বাউন্সার'দের পরিচয় প্রকাশ পেতে দেখা যায় তারা 'কলকাতার পালোয়ান'। হুমায়ূন কবির এখন হেলিকপ্টার চড়া নেতা হতে চাইছেন। মসজিদ নির্মাণ উপলক্ষে যে বিশাল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে তা নয়ছয় হওয়ার উচ্চ আশঙ্কা রয়েছে। অযোধ্যায় যা ছিল 'বাবরি মসজিদ বিতর্ক' বেলডাঙ্গায় তা হতে পারে 'বাবরি মসজিদ কেলেঙ্কারি'।

পশ্চিমবঙ্গে উপাসনালয় বাড়ছে, শিক্ষালয় কমছে। ধর্ম জাগছে, কর্ম ঝিমোচ্ছে। ভক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে, যুক্তি গুরুত্ব হারাচ্ছে। ধর্মের আফিমে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাৎপদতা নিশ্চিতভাবেই ত্বরান্বিত হচ্ছে। পরিশেষে বলতে হয়-- জাগো বাঙালি জাগো।

ফ্যাসিবাদের আগুনে উপমহাদেশ
ধর্ম, রাষ্ট্র ও মব ভায়োলেন্সের রাজনীতি

সৌম্য শাহীন

উপমহাদেশ আজ এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যখন মানুষ পুড়ছে; শুধু আগুনে নয়, রাজনীতির ঘৃণায়। পুড়ছে সহাবস্থানের ইতিহাস, পুড়ছে বহুত্বের স্মৃতি। বাংলাদেশে ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু হিন্দু দীপু দাসকে ধর্ম অবমাননার তথাকথিত অভিযোগে রাস্তায় পুড়িয়ে মারা হয়। ভারতে কেরালার পলাক্কড়ে ছত্তিসগড়ের পরিযায়ী শ্রমিক রামনারায়ণ বাঘেল 'বাংলাদেশি' সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত হন। ভৌগোলিক সীমান্ত আলাদা, ধর্মীয় পরিচয় আলাদা; কিন্তু হত্যার "রাজনীতি" এক। সেই রাজনীতির নাম; ধর্মন্মাদনার ছদ্মবেশে ফ্যাসিবাদ।

এই ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন বলে দেখার প্রবণতাই আজ সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ তাতে হিংসা ব্যক্তিগত উন্মত্ততায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, আড়ালে চলে যায় তার রাজনৈতিক ও কাঠামোগত চরিত্র। দীপু দাসের হত্যাকাণ্ড কোনও 'হঠাৎ উত্তেজিত জনতার কাজ' নয়, যেমন রামনারায়ণের মৃত্যুও নিছক 'ভুল সন্দেহের পরিণতি' নয়। দুটিই দীর্ঘদিন ধরে নির্মিত এক সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল; যেখানে ধর্ম, জাতি ও জাতীয়তাবাদের নামে 'অপর'কে চিহ্নিত করা হয়, এবং সেই চিহ্নিতকরণ শেষ পর্যন্ত হত্যার অজুহাতে পরিণত হয়।

ধর্মের মুখোশে ক্ষমতার রাজনীতি

এই হিংসার রাজনীতি যতটা ধর্মীয় বলে দাবি করা হয়, বাস্তবে তা ততটাই ক্ষমতার। ইতিহাস বলছে, প্রতিটি ধর্মেই মানবিক, সহিষ্ণু, বহুত্ববাদী ধারার পাশাপাশি দমনমূলক, আধিপত্যবাদী ব্যাখ্যাও আছে। প্রশ্ন হল; কোন ব্যাখ্যাটি রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণীর সমর্থন পায়? উত্তরটি সর্বত্র এক; যে ব্যাখ্যা ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সাহায্য করে, যে ব্যাখ্যা ভিন্নমতকে শত্রুতে রূপান্তরিত করতে পারে।

বাংলাদেশে আজ জামাতি-রাজাকার রাজনীতি ধর্মকে ব্যবহার করে সংখ্যালঘু নিধনের সামাজিক বৈধতা তৈরি করছে। ভারতে সংঘ পরিবার 'হিন্দুত্ব'-র নামে একই কাজ করছে। তাত্ত্বিক পার্থক্য থাকলেও এই দুই ধারার রাজনৈতিক চরিত্র অভিন্ন; উভয়ই গণতন্ত্রবিরোধী, উভয়ই একনায়কতান্ত্রিক, উভয়ের কেন্দ্রে রয়েছে 'আমরা বনাম ওরা'-র নির্মাণ। এই 'আমরা' নাকি সংখ্যাগুরু, খাঁটি, জাতীয়তাবাদী; আর 'ওরা' সন্দেহভাজন, বহিরাগত, বিপজ্জনক। বাংলাদেশে এই 'ওরা' হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা, বাউল, ফকির, বিভিন্ন

বামপন্থী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন; ভারতে এই 'ওরা' মুসলমান, আদিবাসী, দলিত, পরিযায়ী শ্রমিক, 'বাংলাদেশি', রোহিঙ্গা। রাষ্ট্র এই বিভাজনকে শুধু প্রশ্রয়ই দেয় না;আইন, প্রশাসন, মিডিয়া ও নীতির মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক করে তোলে।

মব ভায়োলেন্স ফ্যাসিবাদের সামাজিক রূপ

মব ভায়োলেন্স বা গণহিংসা ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে কার্যকর সামাজিক অস্ত্র। এখানে রাষ্ট্র সরাসরি হত্যা করে না;সে কাজটি জনতার হাতে ছেড়ে দেয়। ফলে দায় ছড়িয়ে পড়ে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংগঠনের দায় থাকে না। দীপু দাসকে পুড়িয়ে মারার সময়, রামনারায়ণকে পিটিয়ে মারার সময় পুলিশ কোথায় ছিল;এই প্রশ্ন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কেন রাষ্ট্র বারবার দেরিতে পৌঁছায়? এই দেরি কোনও প্রশাসনিক দুর্ঘটনা নয়। এটি কাঠামোগত। কারণ গণহিংসা শাসকশ্রেণীর পক্ষে উপযোগী;এতে সামাজিক ভয় তৈরি হয়, ভিন্নমত স্তব্ধ হয়, এবং শ্রেণী প্রশ্ন ধর্মীয় মেরুকরণে ঢাকা পড়ে।

আরও ভয়ংকর হল এই হিংসার প্রদর্শন। ভিডিও বানানো হয়, ছবি তোলা হয়, সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো হয়। এটি নিছক নিষ্ঠুরতা নয়;এটি ক্ষমতার প্রদর্শন। এক ধরনের প্রকাশ্য ঘোষণা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আমরা যা কিছু ইচ্ছা করতে পারি, এবং কেউ আমাদের থামাতে পারবে না। রাষ্ট্র যখন এই বার্তার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেয় না, তখন সে নিজেই সেই বার্তাকে বৈধতা দেয়।

'বাংলাদেশি' তকমা ও নাগরিকত্বের অবক্ষয়

রামনারায়ণ বাঘেলের মৃত্যু দেখিয়ে দিল, আজ ভারতের নাগরিকত্ব কতটা শর্তসাপেক্ষ। একজন গরিব পরিযায়ী শ্রমিকের পরিচয় নির্ধারিত হয় তার ভাষা, উচ্চারণ, মুখের গড়ন দিয়ে। 'বাংলাদেশি' শব্দটি আজ আর কেবল প্রশাসনিক শব্দ নয়;এটি একজন মানুষকে ক্যাঙ্গারু কোর্টে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ছাড়পত্র।

এই আতঙ্ক কেরালায় জন্মায়নি। দিল্লির সংসদ, নাগপুরের আরএসএস সদর দপ্তর, টিভি স্টুডিও;এই সব জায়গা থেকেই 'অনুপ্রবেশকারী'-র কল্পকাহিনি সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এনআরসি, সিএএ, ডিটেনশন ক্যাম্প;এই সব নীতিই এই শব্দকে রক্তমাংস দিয়েছে। গণপিটুনির লাশগুলো সেই নীতির সামাজিক প্রতিফলন।

ভারত ও বাংলাদেশ ভিন্ন সরকার, এক শাসক-চরিত্র

ভারত ও বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর মধ্যে আপাত রাজনৈতিক পার্থক্য থাকলেও, তাদের একটি গভীর মিল রয়েছে;উভয়েই ধর্মীয় মেরুকরণকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ভারতে বিজেপি,আরএসএস এই কাজটি প্রকাশ্য ও আগ্রাসীভাবে করে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই রাষ্ট্র মৌলবাদের সাথে আপোস করে চলে, জামাতি শক্তির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ভাঙতে তারা ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ;অনেক ক্ষেত্রে তাদের হাতের ক্রীড়নকমাত্র। এই ব্যর্থতা নিছক অক্ষমতা নয়। এটি শ্রেণীগত সমঝোতা। কারণ ধর্মীয় মেরুকরণ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ভাঙে, শ্রেণী প্রশ্নকে আড়াল করে, এবং শোষনকে আড়াল করতে সাহায্য করে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও মোদী,ইউনূস সমীকরণ

এই সমগ্র প্রক্রিয়ার একটি আন্তর্জাতিক কাঠামো আছে;এবং তার কেন্দ্রে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। উপমহাদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উত্থানকে কেবল 'অভ্যন্তরীণ সমস্যা' হিসেবে দেখলে এই বৈশ্বিক যোগসূত্র অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভারতে মোদী সরকারের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক আজ প্রকাশ্য। ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি, কোয়াড, প্রতিরক্ষা চুক্তি, অস্ত্র বাণিজ্য, নজরদারি প্রযুক্তি;সব ক্ষেত্রেই ভারত মার্কিন ভূ-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এই অংশীদারিত্বের বিনিময়ে মার্কিন রাষ্ট্র ভারতের অভ্যন্তরীণ ফ্যাসিবাদী রূপের দিকে চোখ বন্ধ করে রাখে। মুসলমান নিধন, দলিত নিপীড়ন, গণপিটুনি;সবই 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে বিবেচিত হয়।

কারণ মোদী সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে আদর্শ মডেল;একদিকে আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে কর্পোরেট পুঁজির জন্য উন্মুক্ত বাজার, শ্রমের উপর দমন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। হিন্দুত্ব এখানে বাধা নয়;বরং কার্যকর শাসনযন্ত্র।

বাংলাদেশে সমীকরণটি ভিন্ন রকম হলেও লক্ষ্য একই। ড. মুহাম্মদ ইউনূস আন্তর্জাতিকভাবে 'নোবেলজয়ী', 'নৈতিক অর্থনীতির মুখ' হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এই নৈতিক মুখোশের আড়ালে ইউনূস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোরই এক নির্ভরযোগ্য অংশ। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, মার্কিন এনজিও নেটওয়ার্ক; এই সম্পর্ক কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নয়, এটি একটি শ্রেণীগত অবস্থান।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বাংলাদেশও গুরুত্বপূর্ণ; সস্তা শ্রমের বাজার, চীন-বিরোধী কৌশলের অংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়ন্ত্রিত অস্থিরতার ক্ষেত্র হিসেবে। এই প্রয়োজনে সংখ্যালঘু নিধন বা

গণতান্ত্রিক অবক্ষয় বড় বাধা নয়। ইউনূসের মতো মুখগুলো এই গ্রহণযোগ্যতাকে নৈতিক ভাষা দেয়। এখানেই মোদী ও ইউনূসের আপাত বিরোধ মিলিয়ে যায়। একজন প্রকাশ্য ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী, অন্যজন নয়া উদারবাদী উন্নয়নমূলক অর্থনীতির প্রতীক। কিন্তু দু'জনেই এমন এক শাসনব্যবস্থার অংশ, যা মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে।

নিরপেক্ষতার মিথ

সবচেয়ে বিপজ্জনক হল তথাকথিত নিরপেক্ষতা। যখন বলা হয়; 'দু'পক্ষেই দোষ', তখন হিংসার রাজনৈতিক চরিত্র মুছে যায়। ইতিহাস সাক্ষী; ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় নিরপেক্ষতা মানে নীরব সমর্থন। যারা তখন চুপ ছিল, পতনের সময় তারাই সবচেয়ে বেশি লজ্জিত হয়েছে।

দীপু দাস ও রামনারায়ণ বাঘেল কোনও বিচ্ছিন্ন নাম নয়। তারা একটি ধারাবাহিকতার অংশ। এই ধারাবাহিকতা থামবে না, যতদিন না ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে তার আন্তর্জাতিক ও শ্রেণীগত কাঠামোসহ চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা যায়।

ধর্ম নয়, জাতি নয়; মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আজ উপমহাদেশের সবচেয়ে জরুরি রাজনৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য থেকে সরে গেলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

বাপুর বদলে রাম :
কাজের অধিকারের বদলে সরকারি দয়া

অশোক সরকার

২০ বছর আগে যে আইনে রাষ্ট্রের কাছ থেকে কাজ পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, সেই অধিকার বিলুপ্ত হল, রাষ্ট্রেরই হাতে। ১০০ দিনের কর্ম নিশ্চয়তা আইনে (২০০৫) একাধিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। মানুষ কাজ চাইলে ১৫ দিনের মধ্যে কাজ পাবে, কাজ করলে ৭ দিনের মধ্যে মজুরি পাবে, কাজ দিতে না পারলে বেকার ভাতা পাবে, ইত্যাদি। তার সঙ্গে আরও ছিল। শ্রমের মজুরির পুরোটাই আসবে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাঁড়ার থেকে। এমনকি শ্রম ছাড়া অন্যান্য যা খরচা হবে তারও আধা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। কোথায় কি কাজ হবে তা ঠিক করবে গ্রামসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত। এই ধরণের বিকেন্দ্রীকৃত, অধিকার কেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে তখন লোকসভায় সব কটি রাজনৈতিক দল স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রস্তাবিত নতুন আইনে এর প্রায় সব কিছুই ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের কাজ চাওয়ার কোন অধিকার আর নেই। কেন্দ্রীয় সরকার বলে দেবে কোন রাজ্যের কোথায় মানুষকে কাজ দেওয়া হবে, কেন্দ্রীয় সরকারই তার জন্য রাজ্যকে একটা বরাদ্দ দেবে, যদিও তা হবে মোট খরচার ৬০ ভাগ। বাকি ৪০ভাগ রাজ্যকে দিতে হবে। যদি রাজ্য ৪০ ভাগ দিতে পারে তবেই কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ পাবে। না পারলে আইনটি সেই রাজ্যে বলবতই হবে না। বরাদ্দ সুনিশ্চিত হলে, রাজ্য তখন গ্রাম পঞ্চায়েতকে বলবে তোমরা কাজের ফর্দ তৈরি কর, এক একটা পরিবারকে ১২৫ দিন কাজ দেওয়া যেতে পারে। চাষের মরশুমে ৬০ দিন কাজ দেওয়া যাবে না।

নতুন আইনের মূল কথাটি এইটুকু। হ্যাঁ, এর একটা নতুন নাম দেওয়া হয়েছে। আগের আইনটি ছিল মহাত্মা গান্ধীর নামে, এটির নামকরণ হয়েছে বকলমে রামের নামে। জি রাম জি আইন। আগের আইনটি ছিল বিকেন্দ্রীকৃত, তাই বাপুর নাম সেখানে প্রাসঙ্গিক ছিল। এই সরকারের মানস ও রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে বাপুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং রাজনৈতিক কৌশলের একটি হল রাম, তাই এই নামকরণ।

এ কথা মানতেই হবে যে ২০০৫-এর কর্ম নিশ্চয়তা আইন যতটা সুদূরপ্রসারী ছিল, রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিকতায় তার রুপায়ণে অনেকটাই তা সম্ভব হয় নি। যত দিন গেছে আধার লিঙ্ক, বায়মেট্রিক, ডিজিট্যাল ব্যবস্থা ইত্যাদির দৌলতে গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা গৌণ হয়ে গেছে। ১০০ দিন কাজ অল্প কিছু অঞ্চলে অল্প কিছু মানুষকেই দেওয়া গেছে। ২০ বছর ধরে বেশির ভাগ রাজ্যের মানুষের কাজ পাওয়ার গড় ৪৫ থেকে ৫০ দিনই থেকেছে। মাত্র ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি দেওয়া গেছে। বেকার ভাতা নগণ্য পরিমাণ মানুষই পেয়েছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রের ঝগড়ায় আইনের রুপায়ণটাই বন্ধ থেকেছে পশ্চিমবঙ্গে তিন বছর। সব রাজ্যেই যাতে বেকার ভাতা না দিতে হয়, তাই যতদিন কাজ দেওয়া গেছে, ততদিনই কাজের চাহিদা ছিল বলে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া কনট্রাক্টর ও মেশিন লাগানো, ফেক জব কার্ড, ও অন্যান্য আর্থিক দুর্নীতি তো আছেই।

এর পাশাপাশি মনে রাখতে হবে কোভিডকালে কি হয়েছিল। তখন মানুষের হাতে কাজের একমাত্র সুযোগ ছিল এই আইনে। ২০২০-২১ সালে প্রায় ১০ কোটি গ্রামের মানুষ এই আইনের সুবাদে কাজ পেয়েছিলেন। গড়ে প্রায় ৬৫-৭০ দিন কাজ দেওয়া হয়েছিল। ২০১৯-২০২০ সালের তুলনায় তা ছিল দেড় গুণের বেশি। এক কথায় সেই সময় এই আইন অনাহার মৃত্যু ঠেকাতে পরেছিল বললে অতিশয়োক্তি হবে না। কাজের বিপুল চাহিদা ছিল আর আইন ছিল তাই সরকার বাধ্য ছিল।

সরকারের বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কলকাতা হাইকোর্টের গত জুন মাসের রায়ে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। বলা হয়েছে, কাজের অধিকারটা রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের, দুই সরকারের মতবিরোধের জন্য নাগরিকের কাজের অধিকার থেমে থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেলে, সেই মামলা গৃহীতই হয় নি। এই রায় এমন একটি দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করল, যা দেশের সরকারের কাছে বিড়ম্বনাময়, তাই কি এই আইনটিকে সমূলে উপড়ে ফেলা। কে বলতে পারে।

নতুন আইনটি তাই আগের আইনের অধিকার কেন্দ্রিক কোন প্রতিশ্রুতিই আর বহাল রাখেনি। বরং ২০০৫-এর আগে জহর রোজগার যোজনা, ফুড ফর ওয়ার্ক জাতীয় যে সব প্রকল্প ছিল, সেই ধরণের প্রকল্পের ধাঁচেই ফেরত গেছে। টাকা থাকলে বরাদ্দ, বরাদ্দ হলে কাজ, কাজ হলে মজুরি। তাও রাজ্যের সব জায়গায় নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় যে জেলায় এর শিকে ছিঁড়বে সেখানেই। যেহেতু ঘোষিতভাবেই এই আইনটি বরাদ্দ কেন্দ্রিক, কাজেই যখন যেরকম বরাদ্দ আসবে সেরকমই কাজ হবে। চাষের মরশুমে ৬০ দিন কাজ বন্ধ থাকবে, যাতে কৃষি মজুর পেতে অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ কৃষি মজুর , এতদিন যার কাছে অন্যের খেতে মজুরি, অথবা ১০০দিনের কাজ, এই দুইয়ের মধ্যে চয়েস ছিল, এবং প্রায় সব রাজ্যেই কৃষি মজুরির তুলনায় ১০০ দিনের কাজের মজুরি বেশি ছিল – তা আর রইল না, কৃষি মজুরি যা মিলবে তাতেই তাঁকে কাজ করতে হবে। আর যদি সেই অঞ্চলে খরা হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ ঘোষণা না করলে কৃষি মজুরিও মিলবে না, নতুন আইনে কাজও মিলবে না।

সব মিলিয়ে নতুন আইনে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন কয়েক কোটি গ্রামবাসি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে এতটাই জনবিরোধি কাজ কেন্দ্রীয় সরকার কেন করতে চাইছে। এই স্পষ্ট উত্তর নেই কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে। ২০ বছর বাদে এটা তো পরিষ্কার যে ১০০ দিনের কাজের সফলতা বা বিফলতা ভোটে বিশেষ কোন প্রভাব আর ফেলে না। বরং নগদ টাকা অনেক বেশি প্রভাব ফেলে।

কাজেই সরকারের কাছে এই ধরণের আইনের বদলে নগদ টাকা প্রকল্পের কদর এখন বেশি। আবার অন্য দিকে কাজের অধিকার এখন আইন স্বীকৃত, তাই ফেলেও দেওয়া যাচ্ছে না। তাই কাজের অধিকারের মোড়কটা রেখে সেটির বরাদ্দ কি করে কমানো যায়, সেই দিকে সরকারের নজর। তাই আইনটির গঠন এমন করে তৈরি যাতে সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, সাধারণ মানুষের অধিকার বলে আর কিছু না থাকে।

অধিকারের উপর আক্রমণ শুধু ১০০ দিনের কাজের আইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে হয় না। ২০০৫-এর তথ্য জানার অধিকার আইনে সাধারণ মানুষের অধিকার ইতিমধ্যেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে, ডিজিট্যাল ডাটা প্রটেকশন আইন ২০২৩-এর সুবাদে। ২০১৩-র ভূমি অধিগ্রহণ আইনে গ্রাম সভার সহমতির প্রয়োজনটিকেও খর্ব করা করা হয়েছে, রাজ্য সরকারের আনা আইনের মাধ্যমে। ২০১৪-র স্ট্রীট ভেন্ডর আইনটি, যা কিনা হকারির অধিকারকে জীবিকার অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, তা কার্যত বাক্সবন্দি হয়ে গেছে। ২০০৯ এর শিক্ষার অধিকার আইনটিও তাই। কাজেই যতদিন না এর বিরুদ্ধে সব কটি বিরোধী দল, জনসমাজের সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়নগুলি একজোট হয়ে রাস্তায় নামছে, ততদিন অধিকার হননের এই কাহিনী চলতে থাকবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আবদুল হালিম

(৬-১২-১৯০১ থেকে ২৯-৪-১৯৬৬)

বাংলায় প্রথম যুগের অর্থাৎ গত শতকের দুইয়ের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার অন্যতম সংগঠক আব্দুল হালিম এর একশত পঁচিশতম জন্মবর্ষ পূর্ণ হল। সকলের অলক্ষেই যেনো বছরটা চলে গেলো। তিনি ছিলেন বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার অন্যতম পথিকৃৎ। জন্ম বর্ধমান জেলার কেউবুড়ি। পিতা-- আবুল হোসেন। শিশুকালে তাঁর মা-বাবার মৃত্যু হয়। নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় আসেন এবং নিজ উদ্যোগে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৯২১ খ্রী- চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে মুজফ্ফর আহমেদ ও আবদুর রেজ্জাক খানের সহযোগী হন। তাঁদের সাহায্য করতেন বুক কোম্পানীর কুতুবুদ্দিন আহমদ। নজরুল ইসলামের পরিচালিত 'লাঙল' (১৯২৫) ও ১৯২৬ স্ত্রী-মুজফ্ফর আহমেদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'গণবাণী' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রী- গঠিত লেবর স্বরাজ পার্টির হেমন্তকুমার সরকার, সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অ্যাডভোকেট অতুল গুপ্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯২৬ খ্রী এই পার্টির নাম পরিবর্তন করে হয় 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি'। তিনি এই পার্টির কাজ

পরিচালনা করেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফফর আহমেদ ১৯২৯ ৩৬ খ্রী- জেলে আবদ্ধ থাকা কালে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব তিনি বহন করেছেন। ১৯৩০ খ্রী- 'কার্টার্স স্ট্রাইক'-এর সময় ইস্তাহার প্রকাশ করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩০ - ৩২ খ্রী ৮ জন সর্বক্ষণের কর্মীকে নিয়ে তিনি কর্মীদের মার্ক্সবাদী পুস্তকাদি পড়াতেন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পার্টি গ্রুপগুলিকে একসূত্রে বাঁধার কাজ করেছেন। ১৯৩৩ খ্রী- তাঁর উদ্যোগে এবং রণেন সেন ও সোমনাথ লাহিড়ীর সহযোগিতায় কলিকাতায় গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির একটি সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয় তিনি তার সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ১৯৩১ -- ১৯৩৪ সালে তাঁর সহায়তায় ছাত্র লীগ গঠিত হয়। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বাংলা ও হিন্দিতে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সব পত্রিকার প্রকাশক,লেখক, সম্পাদক হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ১৯৩৪ - ৩৮ সালে কারাগারে থাকার সময় বন্দিদের মধ্যে মার্কসবাদ প্রচার করতেন। ১৯৪০ - ৪২ সালে তিনি নিবর্তনমূলক আটক আইনে আটক থাকেন। স্বাধীনতার পরও তিনি ১৯৫০ - ৫২ সালে এই আইনে বিভিন্ন বন্দি শিবিরে আটক থাকেন। দীর্ঘ দিন আত্মগোপন করে পার্টি করেছেন। ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৮ - ৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন সহ বিভিন্ন গণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। নভেম্বর, ১৯৬২ সালে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে মার্চ, ১৯৬৪ পর্যন্ত বন্দি থাকেন। জুলাই ১৯৬৫ খ্রী- পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে তিনি মৃত্যুর মাত্র ১০ দিন আগে ছাড়া পান। তাঁর রচিত পুস্তক টীকা সহ কমিউনিস্ট ইশতেহার, কমিউনিজম, রুশিয়ার গণআন্দোলন প্রভৃতি। ১৯৫২ খ্রী নির্বাচন থেকে আমৃত্যু বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার --

১) সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড।

২) ডা. রণেন সেনের স্মৃতিচারণ।

এলোমলো কথা

বাংলাদেশ কোন পথে যাবে ?

শুভ বসু

বাংলাদেশে নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে বলে এখনো নির্ধারিত। পরিকল্পিত ভাবে নির্বাচন বানচাল করতে সংবাদ মাধ্যম , সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপর আক্রমণ বা একজন সংখ্যালঘু সমাজের পোশাক কর্মী কে হত্যা করা হয়েছে। তার পূর্বে একজন উদীয়মান রাজনৈতিক কর্মী ওসমান হাদি কে অজ্ঞাতনামা আততায়ীরা হত্যা করে , সেই সুযোগে ইসলামিক উগ্রবাদী লোকজন রাস্তার মধ্যে বলপ্রয়োগের রাজনীতি করেছেন। সেই সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মর তরুণদের একাংশ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ , তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ,বাংলাদেশে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পিছনে দায়ী কারা তাই নিয়ে বানোয়াট তত্ত্ব প্রচার করছেন। গ্রামশ্চির ইতিহাসের ভাষায় এরা একটি কাউন্টার হেজেমোনিক ডিসকোর্স করতে চাইছেন। এবং কৌশলগতভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতার একাংশ এখন তাঁদের সেই ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। ১৯৮০র দশক থেকে কোরীয় প্রযুক্তির সহযোগিতায় দেশের ডাক বলে একটি বাণিজ্যিক সংস্থার হাত ধরে বাংলাদেশে ধীরেধীরে পোশাক শিল্প কে কেন্দ্র করে একটি নতুন পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিকাশ হয়। যা শিল্পায়নের প্রথম পর্য্যায়ে হয় পোশাক শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করে , মূলত তাদের একটি অনিয়মিত শ্রমিক গোষ্ঠীতে পরিণত করে এবং যেহেতু সে শ্রমিকরা মহিলা শ্রমিক সেহেতু তাদের উদবৃত্ত আনতে সুবিধা হয়। তবে পোশাক শিল্পের বাজার আন্তর্জাতিক ভাবে খুবই প্রতিযোগিতা মূলক এবং সেখানে বাংলাদেশ কে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে চীন, এবং ভিয়েতনাম এর সঙ্গে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫৭.৯৮ (USD Billion) বাজারের অংশীদার হবার প্রয়াস করতে হচ্ছে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তবে পোশাক শিল্পের সফলতার ফলে অর্থনীতিতে সূচিত হয় প্রবৃদ্ধির হার। সেই সঙ্গে উন্নত অর্থিনীতিতে বাংলাদেশের থেকে অভিবাসনকরি শ্রমিকদের আগমনের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য রেমিট্যান্স একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনরেখাতে পরিণত হয়েছে। যা বৈদেশিক মুদ্রার একটি প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে, রিজার্ভ বৃদ্ধি করে, টাকা স্থিতিশীল করে এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে। সাম্প্রতিক রেকর্ড পরিমাণ (২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি) প্রবাসী আয় বর্ধিত আনুষ্ঠানিক চ্যানেল, সরকারি প্রণোদনা এবং থেকে বিনিময় হারের ব্যবধান হ্রাসের ফলে ভোগ, বিনিয়োগ এবং জাতীয় সঞ্চয়কে সমর্থন

করে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং ওমানের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি এবং সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ব্রিটেন , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা থেকে এই শ্রমিকরা তাঁদের রেমিট্যান্সের পাঠান। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হারের ঊর্ধ্বগতি হয়।

বিশ্বে অর্থনীতিতে চীনের উত্থান এবং চীনারাষ্ট্রর বৈদেশিক নীতি বাংলাদেশের বিদেশী পুঁজির সরাসরি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) বাংলাদেশের জন্য একটি প্রধান উন্নয়ন কৌশল, যা ২০১৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করে চীনা বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে অবকাঠামো (রাস্তা, রেলপথ, বিদ্যুৎ) এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে, যদিও ঋণ, স্বচ্ছতা, পরিবেশগত প্রভাব এবং ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। মূল প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে পদ্মা সেতু , রেল লিঙ্ক এবং জ্বালানিতে উল্লেখযোগ্য চীনা বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (সিএফডিআই), সংযোগ বৃদ্ধি এবং শিল্প প্রবৃদ্ধি। পদ্মা সেতু রেল লিঙ্ক, বিদ্যুৎ কেন্দ্র (যেমন, পায়রা), এবং আইসিটি নেটওয়ার্কের মতো প্রধান প্রকল্পগুলি চীনা অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে, বাণিজ্য খরচ হ্রাস এবং পরিবহন উন্নত করা হচ্ছে। বিআরআই বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ এবং বাংলাদেশের অবস্থান এবং শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে কাজ করে, চীন একটি শীর্ষ এফডিআই উৎস হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ বিআরআইকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠার সুযোগ হিসেবে দেখে। সেই সঙ্গে জাপান এবং ভারত বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে। এক পর্যায়ে সামগ্রিক ভাবে পুঁজির উত্থান , আমলাতন্ত্র , সেনাবাহিনীর সংযোগের ফলে দুর্নীতিরও বিকাশ হয় বিরাম হীনভাবে। রাষ্ট্রর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা সেই দুর্নীতির বিকাশে সহযোগিতা করে। তবে পুঁজির বিনিযোগের একটি পর্য্যায়ে বিশ্বের বহু অঞ্চলে যেমন কোরিয়াতে , তাইওয়ানে একটি স্বৈরতন্ত্রী এক দলীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিকাশ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন (পার্ক চুং হির মতো) প্রাথমিকভাবে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করে, একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র তৈরি করে এবং অবকাঠামো নির্মাণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, যা শাসনের বৈধতাকে শক্তিশালী করে। যাইহোক, এই প্রক্রিয়া - শিল্প সম্প্রসারণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক গতিশীলতা - অনিচ্ছাকৃতভাবে শক্তিশালী, সংগঠিত গোষ্ঠী (ছাত্র, শ্রমিক) তৈরি করে, যারা জাতীয় নেটওয়ার্কগুলিকে কাজে লাগিয়ে অবশেষে গণ-বিক্ষোভের পিছনে চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে যা ১৯৮০ -এর দশকের শেষের দিকে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয় এবং গণতন্ত্রের সূচনা করে, যা দেখায় যে উন্নয়ন তার নিজস্ব রাজনৈতিক রূপান্তরের বীজ বপন করতে পারে।

বাংলাদেশের এক্ষেত্রে মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় দুটি। বাংলাদেশের ভু রাজনৈতিক অবস্থান। বাংলাদেশ ভারতের দ্বারা বেষ্টিত এবং বাংলাদেশের নদীর বিপুল জলপ্রবাহ ভারতের থেকে বাংলাদেশ প্রবাহিত হয় আর বাংলাদেশের থেকে ভারতে অভিবাসনকারী শ্রমিকদের যাতায়াতের ফলে ভারত বাংলাদেশের চারপাশে বেড়া নির্মাণ করে শূন্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে গুলি চালানোর নীতি গ্রহণ করে। সেই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত থাকে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী সরকার প্রায় রণহুঙ্কার দিতেন বাংলাদেশের অভিবাসনকারী শ্রমিকরা উইপোকার মতো। তাদের কে পিষে মেরে ফেলা হবে। আবার তাঁরা স্বাভাবিকভাবে শেখ হাসিনার ভারতের সঙ্গে মিত্রতার নীতি সমর্থন করতেন। সেই দ্বিচারিতা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে আশংকা এবং উষ্মার সৃষ্টি করে।

২০০২ সালের পর থেকে সারা পৃথিবীতে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা নিয়েছে খ্রিস্টান রক্ষণ শীল ভূমিকা যে কারণে রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ একটি স্বাক্ষাৎকারে বলেছিলেন তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন যীশু খৃস্ট। মুসলিম জাহানে সিরিয়া, লিবিয়া , লেবানন পুরো গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং আফগানিস্তান অনুভব করে গৃহযুদ্ধ। ইসরাইলের উগ্র জায়নবাদ এর ক্ষমতার উগ্র দম্ভ গাজাকে ধ্বংস করে। বাংলাদশে ঐতিহাসিক ভাবে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মেরুকরণ , আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার উপমহাদেশে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ , দেশ ভাগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সংবেদনশীলতা সবই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিক্ষার সংকট , বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয়করণ , মুক্তিযুদ্ধ'র ইতিহাস কে বিকৃতকরণ এবং ধর্ম নিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের অপসারণ, সব মিলিয়ে বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানের পর এক তথাকথিত তৌহিদী জনতার উদ্ভব এবং দক্ষিণপন্থী ঐস্লামিক গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা দখলের প্রয়াস নির্বাচনের পরিবর্তে সংবিধান সংস্কারের নাম করে। ফলে শুরু হয় সন্ত্রাসের রাজত্ব , মব সন্ত্রাস রাষ্ট্রর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের নর্তন কুর্দন আস্ফালন। আর যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির দস্তুর, সুযোগ পেলেই সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার।

আওয়ামী লীগের রাজত্ব 'র অবসানের পর মধ্যপন্থার রাজনীতিতে একটি শূন্যস্থান বিরাজ করছিলো । বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দ্বিধাবিভক্ত ছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, মূলত আওয়ামী

লীগের মতো পারিবারিক কারিশমার উপর নির্ভরশীল একটি দল, পারিবারিক নেতৃত্বর উপস্থিতির অভাবে একেবারে নির্জীব হয়েছিল। আজকে জনাব তারেক রহমানের দেশে ফেরার ফলে তাদের দলীয় রাজনীতিতে একটি জোয়ারের সূচনা ঘটেছে। বাংলাদেশে মধ্য দক্ষিণপন্থার একটি নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দৃঢ় হয়েছে। আর যাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে একটা অনুরোধ। এই লড়াইটা যেমন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। আপনারা এই লড়াই করেন নির্মোহভাবে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি নিয়ে। এর কোনো স্বল্প মেয়াদি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাবার উপায় নেই। বামপন্থিদের একটি শ্রেণীভিত্তিক বিপ্লবী গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি বহু বছরের সাধনার প্রয়োজন। আমার মনে হয় বামপন্থার ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে সংলাপের প্রয়োজন রয়েছে। একদিন বাংলাদেশে স্বাধীন উন্নতমানের জীবন যাত্রা সম্বলিত সহিষ্ণু সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে ধর্ম হবে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আর রাষ্ট্র হবে সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্র সেই উম্মীদ নিয়ে এই বক্তব্য শেষ করছি।

প্রতারিত বাংলাদেশের মানুষ , বিভ্রান্ত 'Mastermind' এর দল।

মনিরুল হক

প্রথমেই বাংলাদেশের প্রধান ইংরেজি দৈনিক 'The Daily Star'এর সম্পাদক ও প্রকাশক, বর্ষীয়ান সাংবাদিক মাহফুজ আনমের দুটো ভাষণের অল্প অল্প অংশ আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখছি। প্রথম ভাষণের তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর '২৫ -

'(বিগলিত হয়ে) মিডিয়া বান্ধব সরকার প্রধান যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে আমরা এখন পেয়েছি এবং আমরা এর জন্য অত্যন্ত আনন্দিত।'

আর দ্বিতীয় ভাষণর তারিখ ২২ ডিসেম্বর '২৫ -

'(চোখে-মুখে আতঙ্ক, ধরা গলায়) মত প্রকাশ তো অনেক দূর, বেঁচে থাকার ব্যাপার সামনে এসেছে'।

দুটো ভাষণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান চার মাসও না। আমাদের পক্ষে তো বোঝা মুশকিল কোনটা সত্যকথন আর কোনটা অনৃতভাষন ! বাংলাদেশ তো সেই ২৪ এর জুলাই থেকে যেমন চলছিল তেমনই চলছে। ঘটে চলেছে বড় বড় সব ঘটনা। দুই ভাষণের মাঝে শুধু ন্যানো সাইজের একটা ঘটনা ঘটেছে। ইসলামিস্ট বিপ্লবীরা টুক করে মাহফুজ সাহেবের পত্রিকা ভবনে আগুন দিয়েছে। একই আগুনে ঝলসে গিয়েছিল 'প্রথম আলো'ও। সত্য তো পরিবর্তিত হয় না কিন্তু মিথ্যার মুখোশ খসে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রমাণ হল, ২৪ এর জুলাই থেকে যে মিথ্যা ইউনুস সাহেব নিজে, তাঁর সরকার ও ইসলামিস্ট জঙ্গীরা প্রচার করে যেতে বলেছেন (সে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করা হোক বা পুলিশ হত্যা হোক বা সংখ্যালঘুদের জীবন-সম্পত্তি ধ্বংস করা হোক বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আগুন লাগানো হোক বা সর্বস্তরে উগ্রপন্থীদের ফ্রীহ্যান্ড দেওয়া হোক) সেই মিথ্যাই প্রচার করে এসেছে The Daily Star– প্রথম আলো সহ বড়-মাঝারি-ছোট সব মিডিয়া হাউস। সারা দেশ যখন ধারাবাহিক ভাবে জ্বলছে তখন তাকে বলা হচ্ছিল 'বিক্ষুব্ধ জনতার ক্ষোভ'। আসলে দেশ জুড়ে যা চলছে তা হল উগ্র ইসলামি শিবিরের পরিকল্পিত এবং রাষ্ট্র পরিচালিত এক মহাসন্ত্রাসের যজ্ঞ।

ক্ষমতা আছে বটে বাংলাদেশী ইসলামিস্ট বিপ্লবীদের। তাঁরা প্রতারণা করেছেন বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবি, চাকুরিজীবি-মধ্যবিত্ত, গ্রমীণ মানুষদের একাংশ, রিকশাওয়ালা সহ শহরে বসবাস করা খেটে খাওয়া মানুষজনের সঙ্গে এবং অবশ্যই রাস্তার টোকাইদের সঙ্গেও। কুচক্রীরা শুরু করেছিলেন যে শ্লোগান দিয়ে তা হল, -

'মুজিবের বাংলায় - বৈষম্যের ঠাঁই নাই'।

মাঝপথে তাদেরই শ্লোগান ছিল,-

'জাতির পিতা ইব্রাহিম - শেখ মুজিব ঘোড়ার ডিম'।

আর তারপর -

'মুজিববাদ - মুর্দাবাদ'।

নানান রঙে, নানান ঢালে, নানান ছন্দে তাঁরা আসলে ছিলেন কুখ্যাত জামায়াত ইসলামের অঙ্গ। অঙ্গগুলো ছিল আল-কায়দা, জে বি এম থেকে শুরু করে কট্টর ইসলামিস্ট সব গ্রুপ, অতীব রক্ষণশীল, চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক, বহু লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার হত্যাকারী, পাকিস্তান প্রেমে কাতর, দেশে শরিয়তী আইন লাগু করার স্বপ্নে বিভোর একটা বড় জনসমষ্টি। ৫ আগস্ট, ২০২৪ এর পর শুরু হয়েছিল বিদেশি এজেন্ট, দেশের অর্ধ-নাগরিক, মানুষখেকো- অগণতান্ত্রিক- কর্তৃত্ববাদী বড় বড় এন জি ও এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গীগোষ্ঠীর এবং এদের ভয়ে ভীত সংবাদপত্র গোষ্ঠী ও অন্যান্য মিডিয়ার এক যৌথ শাসন। রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার পেল আমেরিকা-পাকিস্তান-তুরস্কের মদতপুষ্ট, সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র ইসলামিকদের এক হিংস্র ক্ষমতাবলয়।

এর আগে বাংলাদেশ নির্বাচিত সরকার দেখেছে, সামরিক শাসন দেখেছে, তদারকি সরকারও দেখেছে। কিন্তু সাধারণ জনগনের প্রতি এরকম চরম উদাসীন সরকার মানুষ কখনও দেখে নি। একে তো সরকার জনবিচ্ছিন্ন, তার উপর আবার প্রভাব বিস্তারে এগিয়ে আছে জামায়েত ইসলামি। শোনা যায় সমস্ত নিয়োগ, পোষ্টিং, বদলি সবেতেই অনুমোদন লাগে জামাতের। উপদেষ্টাদের বড় অংশই অযোগ্য, তার উপর আর্থিক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পুরোপুরি জামাত নিয়ন্ত্রিত। অভিনব সব চক্রান্তের পরিকল্পনা এবং গুপ্তহত্যা তাদের রণকৌশলের অঙ্গ। কটুবাক্য-শিরোমণি তীব্র আওয়ামী বিরোধী, বঙ্গবন্ধুর বাসভবন (পরবর্তীতে মিউজিয়াম) ভাঙার অন্যতম হোতা, ইনকিলাব মঞ্চ নামক একটি উগ্র ইসলামিস্ট গ্রুপের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে জামাতের হাত ছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

একদিকে যখন এইরকম খুনোখুনি চলছে তখন অপরদিকে ইউনুস সরকার হাদিকে জাতীয় আইকন হিসাবে ঘোষনা করছে। কে যে কখন কোন পক্ষে থাকছেন অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করছেন তা কেউ বুঝতেই পারছেন না। সবটাই মধ্যযুগীয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আরও ভালো থাকবেন, এই আশায় একটা বড় অংশের মানুষ ইউসনুস সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু সবাই, সব পক্ষই প্রতারিত হয়েছেন বা হচ্ছেন।

শুধু সাধারণ মানুষ নন,যাঁরা হাসিনা সরকারকে উৎখাত করতে প্রথম সারিতে ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরাও নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করছেন। এই দলে আছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একটি বৃহৎ অংশ। উৎখাত আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন বহু কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মী-সামাজিক আন্দোলনের কর্মী। তাঁরাও বুঝতে পারছেন, তাঁদের আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলছেন জামায়েত ইসলামী ও অন্যান্য অন্ধকারের শক্তি। 'সফল বিপ্লব' এর পরে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন কঠোর আওয়ামী বিরোধী নাট্যব্যক্তিত্ব জামিল সাহেব। কিন্তু তিনি অপমানিত হয়ে অপসারিত হন। সাংস্কৃতিক সংস্থা 'উদীচী'র অসংখ্য শাখা আছে দেশ জুড়ে। তারাও 'বিপ্লবী'দের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল হাসিনার 'অপশাসন'এর অবসান কামনা করে। কিন্তু সীতা হলেই হয় না, অগ্নিপরীক্ষারও প্রয়োজন। উদীচীকেও আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতে চাইল মৌলবাদীরা। রেহাই পায়নি 'ছায়ানট'ও। আগুন লাগানো হয়েছে খবর পেয়ে New Age পত্রিকার কর্ণধার নূরুল কবির সাহেব প্রশাসনের সব স্তরে এমনকি সর্বোচ্চ স্তরেও কথা বলেছেন কিন্তু কোন সাড়া পান নি। তারপর তিনি যখন অকুস্থলে এসেছেন তখন বিপ্লবীরা তাঁকে হালকা ম্যাসেজ করে দিয়েছেন বলে ছবিতে দেখা গেছে। হাসিনা বিরোধী আন্দোলনে অন্যতম 'Mastermind' ছিলেন সাংবাদিক জাইমা ইসলাম। অগ্নি উপাসকরা তাঁকেও ছাড় দিতে চায় নি। জাইমা নিজের জীবন বাঁচাতে কাতর আবেদন জানাচ্ছেন আগুন লাগাতে আসা প্রাণপ্রিয় বন্ধুদের প্রতি, - 'You are killing me'! আওয়ামী বিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সৈনিক বিশিষ্ট সাংবাদিক আহমেদ ইশতিয়াক বলে উঠছেন,'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'। প্রবীণ বামপন্থী অধ্যাপক, আজীবন আওয়ামী বিরোধী, শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও এবারের হাসিনা বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া আনু মহম্মদ এই সেদিন প্রকাশ্য সভায় হাহাকার করে উঠলেন, 'এই সরকার তো চাইনি'!

সবচেয়ে করুণ পরিনতির দিকে যাচ্ছেন হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের খিচুড়ি নেতারা। জামায়েত ইসলাম ও অন্ধকারের জীবরা এঁদের ঠেলে দিয়েছিলেন পিছন থেকে। হঠাৎ নেতা বনে যাওয়া এই তরুণদের না আছে কোনও আদর্শ, না আছে কোনও দৃষ্টিভঙ্গি। বিপুল জনসমষ্টিসম্পন্ন সমস্যাসঙ্কুল একটা দেশের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে তার সাধারণ রূপরেখাও তাঁরা বিগত দেড় বছরে আঁকতে পারলেন না। পারবেন কি করে, তাঁদের নিজেদের বর্তমান-ভবিষ্যৎও তাঁদের নিজেদের হাতে নেই! তাঁরা প্রথমে ঘোষণা করলেন আগামী নির্বাচনে তাঁরা সমস্ত আসনে (৩০০) প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। পরে বললেন ১৫০ টি আসন তাঁরা জিতবেন। শেষে ৩০ টা আসনে লড়বেন এই শর্তে জোট করেছেন জামাতের সাথে। তবে শোনা যাচ্ছে, যে সব আসনে জামাতের জেতার কোন সম্ভাবনা নেই সেই সব আসনে লড়বেন সেই তরুণরা এন সি পি দলের প্রতীকে। নির্বাচনের ফল কী হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না তবে এই তরুণেরা যে আসলে জামায়েত ইসলামের প্রোডাক্ট তার প্রমাণ তাঁরা আরও একবার দিলেন।

তবে এই তরুণদের অনেকেই ফরহাদ মজহারের ভক্ত। সেই হিসাবে মজহার সাহেবও 'জুলাই বিপ্লবে'র একজন 'Mastermind'। চিন্তক ও বুদ্ধিজীবি হিসাবে তিনি বাংলাদেশে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তাই এই তরুণদের রাজনীতি বুঝতে গেলে মজহার সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটু জানা প্রয়োজন। প্রথমত তিনি বহুবার এই কথা বলেছেন যে, বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতি ইসলাম বিদ্বেষী। এই বামপন্থা ইসলাম নির্মুল করতে চায়। দ্বিতীয়ত ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধান বাতিল করতে হবে। (প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভালো, বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয়তা,

ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, এই চার মূল নীতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে)। মজহার সাহেবের মতে যারা '৭২ এর সংবিধানের পক্ষে কথা বলে তারা দিল্লির দালাল, ফ্যাসিস্ট ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত! তথাকথিত জুলাই আন্দোলনের আর একজন কট্টর সমর্থক, বামপন্থী হিসাবে স্বীকৃত বদরুদ্দিন উমর মৃত্যুর কিছুদিন আগে ঘোষণা করে গেছেন, - মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ৯০ শতাংশ মিথ্যা। একটা কথা এখানে না বললেই নয় যে, বাংলাদেশের সাধারণ কৃষক, জেলে, কামার, কুমোর, শ্রমিক, সুফি, বাউল সে তিনি মুসলিম বা হিন্দু যাই হোন না কেন, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে আত্মার গভীরে ধারণ করেন কিন্তু শিক্ষিত মুসলিমদের একটা অংশ স্বাধীন বাংলাদেশ চান নি, চেয়েছিলেন ইসলামিক বাংলাদেশ। আর অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলিম অন্য অংশ চেয়েছিলেন পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধই থাকুক।

প্রখ্যাত 'Mastermind' মহাফুজ আলম সেই প্রথম থেকে বলে আসছেন বাংলাদেশের সর্বনাশ করেছেন শেখ মুজিবর রহমান। মুজিববাদের কবর রচনা করাই তাঁর লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। 'মন্ত্রী' হয়ে মন্ত্রকে গিয়ে তিনি প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হল ঘরের দেওয়াল থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবিটি নামিয়ে ফেলা। আর এই সেদিন মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগের পর প্রকাশ্যে বললেন, 'আমাদের ভুল হয়েছে। মুজিববাদের শিকড় Intalectually Politically–culturally বাংলাদেশের অনেক গভীরে'।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে জামায়াত ইসলাম, এক শ্রেণীর বাম আর ফরহাদ মজহার বেষ্টিত এই তরুণরা আর যাই হোক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রিয়, গনতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার শরিক হতে পারবেন না।

ভারতবর্ষের উগ্র হিন্দুদের প্রতিভূরা খুন করেছিল মহাত্মাকে। খুনের আগে ও পরে এই হত্যাকান্ডকে বৈধতা দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে। সেই উগ্র হিন্দুদের বর্তমান পোস্টারবয় মোদিজী এখনও নানাভাবে খুন করে চলেছেন গান্ধীজীকে। কিন্তু গান্ধীবাদ মরে নি। একইভাবে ক্ষমতালোভী ও ধর্মান্ধ মুসলিমদের হাতে খুন হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই হত্যাকান্ডকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা কম হয় নি। মহম্মদ ইউনুসের রাজত্বকালে সেই প্রচেষ্টা চরমে উঠেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর উচ্চতা কমে নি।

বাংলাদেশের আমজনতার হৃদয় জাতির পিতা হিসাবেই বিরাজ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

বাংলাদেশে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পাল্টা কোন বয়ান নিয়ে রাজনীতির আঙিনায় 'করে খেতে' চান তাঁদের প্রধান বাধা মুজিবর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ। ২০২৪ এর জুলাই থেকে সেই প্রচেষ্টাই নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই 'জুলাই বিপ্লব'- এর স্টেক হোল্ডাররা বিভ্রান্ত। সেই বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসার একটাই পথ - ভারত বিরোধিতা,ভারত বিরোধিতা এবং ভারত বিরোধিতা। অসাধারন সেই পথটা নতুন ফ্লেভারে পরিবেশন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত ফটোগ্রাফার এবং ফ্লোটিলায় গাজা অভিযানের নায়ক, জুলাইয়ের অন্যতম 'Mastermind' শহিদুল আলম - "The tree that the corpse of Dipu Chandra Das was hung from and set on fire– was in the divider in the middle of a busy road. It was happened in public and was allowed to happen. I understand how angry people are and the resentment towards the authoritarian Seikh Hasina and her regime as well as against India for sheltering killers..."

শ্রদ্ধেয় শহিদুল আলম , যাঁরা 'তৌহিদী জনতা' অথবা 'মব সন্ত্রাসী' বলে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন তাঁদের মহান কর্ম 'দীপু চন্দ্র দাসের' হত্যার কৃতিত্বও ভারতের হাতে তুলে দিলেন!

ইতিহাস

জাতীয় কংগ্রেসের একশো চল্লিশ বছর

সায়ক ঘোষ চৌধুরী

আজ থেকে ঠিক ১৪০ বছর আগে ৭২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁদের কেউ সাংবাদিক, অধিকাংশই আইনজীবী এবং কয়েকজন সমাজসংস্কারক , তৎকালীন বোম্বে শহরের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে একত্রিত হন। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের কাছে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে দেশীয় মানুষদের কিছু দাবি দাওয়া তুলে ধরা। রাজনৈতিক দল কী বস্তু বা ইংরেজিতে যাকে বলে nation state, সেটি কী, সেই ব্যাপারে তৎকালীন আমভারতীয়দের কোনো ধারণা ছিলো না। যে বাহাত্তর জন, ১৮৮৫ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর বোম্বেতে জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলত সমাজের উপর তলার মানুষ। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রথম প্রজন্ম। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁদের পাশ্চাত্য গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছিল। তাঁরা একটি মঞ্চ তৈরি করতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে (পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক মডেল অনুসরণ করে) তাঁরা ভারতীয়দের বিভিন্ন দাবিদাওয়া ইংরেজ শাসকদের কাছে তুলে ধরতে

পারেন। সেই মঞ্চের নাম ঠিক করলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস খুব সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র রাজনৈতিক দল বা পার্টি যার নামে পার্টি বা দল এই শব্দটি নেই।

১৯১৫ সালে এই মঞ্চে সামিল হন এক বিলেত ফেরত গুজরাটি ব্যারিস্টার।কিছুদিন আগেই দক্ষিণ আফ্রিকায় যিনি বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এক অভিনব উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি আলোকিত মঞ্চের উচ্চতা থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে নামিয়ে আনলেন পথের ধূলোয়। আসমুদ্র হিমাচল বাঁধা পড়ল একটি সুতোয়। জাতীয় কংগ্রেস হয়ে উঠলো সেই সুতো। বাকিটা ইতিহাস।

গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ভিত তৈরী করে দিয়েছিল এক গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, কল্যাণকর রাষ্ট্রের। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই গুপ্ত বিপ্লববাদি, কমিউনিস্ট, সমাজবাদী সকলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এক দশক কম দেড় শতক পরে সেই রাষ্ট্রের গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন। এই দুঃসময় থেকে দেশকে বের করে আনার মূল দায়িত্ব প্রাথমিক ভাবে ১৪০ বছর আগে আজকের দিনে জন্ম নেওয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। কারণ ভারতবর্ষের ধারণা আসলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হৃদয় থেকে উৎসারিত। এই ভারতবর্ষকে কংগ্রেসকেই রক্ষা করতে হবে। হতাশার কোনো কারণ নেই। মনে রাখবেন এই মহাদেশের সাহিত্যে প্রথম নোবেল পাওয়া কবি, যিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্বও করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— '' রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে''। আমরা আমাদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ আবার ফিরিয়ে আনবই।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(১)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর কানপুরে এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিও এই মত পোষণ করতো। এই বছর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ পূর্ণ হল। ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয় কংগ্রেসের পরই সব চাইতে প্রবীণ দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। যদিও এই দল আর অবিভক্ত নেই। ১৯৬৩ সালে সিপিআই ভাগ হয়ে সিপিআই(এম) গঠিত হয়। বিভাজনের পর ২০২৪ সালে সিপিআই (এম) দলের বয়সও অর্ধশতক অতিক্রম করেছে এবং এটিই এখন বৃহত্তম কমিউনিস্ট নামক পার্টি। এই দলেও ১৯৬৯-৭০ সালে ভাঙন হয় এবং যে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙনের পর সিপিআই(এম) দল গঠিত হয়, সেই চিনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এক অংশ সিপিআই (এম) থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিপিআই (এমএল) গঠন করে। অতঃপর এই দলেও বহুবার ভাঙনের পর তাও বহুধাবিভক্ত। কমিউনিস্ট পার্টির জন্মকাল নিয়ে অবশ্য সিপিআই (এম) ভিন্ন মত পোষণ করে। তাদের মতে ১৯২০ সালে তাসখন্দে প্রবাসী কমিউনিস্টরা মিলিত হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে।

উপরোক্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ছাড়াও আরও কিছু দল আছে যারা নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করে যথা আর এস পি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), আর সি পি আই. পেজান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি (মহারাষ্ট্র), ইউ সি পি. আই প্রভৃতি। এই দলগুলির মধ্যে আর এস পি পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের শরিক, কেরলে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে এক ফ্রন্টে আছে। বর্তমানে বৃহত্তর বাম ঐক্যের মঞ্চে সিপিআই (এমএল)লিবারেশন সদ্য যোগ দিয়েছে।

এতগুলি কমিউনিস্ট পার্টি থাকা সত্ত্বেও দেশে বামপন্থা ও সাম্যবাদী মতবাদের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। এই স্বল্প পরিসরের নিবন্ধে এর কারণ প্রসঙ্গে কিছু এলোমেলো চিন্তাভাবনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে এবং এই চিন্তাভাবনা মূলত সিপিআই (এম) ও তার শরিক ও আদি রূপ সিপিআই দল দুটির রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

স্বাধীনতা পূর্ব অধ্যায়

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের বার্তা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। জারের শাসনের অবসান ও মজুর কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠার সাম্যবাদী মতবাদের দ্বারা প্রাথমিকভাবে কিছু তরুণ যুবা প্রভাবিত হন। ক্রমশ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যেও খুব ক্ষীণভাবে এই মতবাদ প্রতি ফলিত হতে শুরু করে।

কমিউনিস্ট দের ওপর আক্রমণ

জন্মলগ্ন থেকেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কমিউনিস্টদের ওপর হিংস্র আক্রমণ শুরু করে। ১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতীয় কৃষকদের একটি দল তুরস্ক অভিমুখে রওয়ানা হয়। রাশিয়ার মজুর - কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুনে এই কৃষকদের একটি অংশ আফগানিস্তান হয়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার তাশখণ্ডে উপস্থিত হন। তাঁদের সঙ্গে প্রবাসী কমিউনিস্ট মানবেন্দ্র নাথ রায়ের সাক্ষাত হয়। তিনি এই কৃষকদের কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণে সম্মত করান। এই কৃষকরা ভারতে ফেরা মাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২২-২৩)।

এই মামলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিচার, যেখানে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল; এই মামলায় অনেক কম্যুনিস্ট নেতা ও মুহাজির (দেশান্তরী) যুবককে আসামি করা হয়েছিল এবং এটি ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনের একটি বড় পদক্ষেপ ছিল, যা পরবর্তী কানপুর ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পথ খুলে দেয়।

গুরুত্ব: পেশোয়ার মামলার পর ব্রিটিশ সরকার একই উদ্দেশ্যে কানপুর (১৯২৪) ও মীরাট (১৯২৯) ষড়যন্ত্র মামলাগুলো শুরু করে, যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ও ব্রিটিশ দমন-পীড়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তৈরি করে।

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলাটি ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ ভারতে শুরু হওয়া একটি বিতর্কিত আদালতের মামলা।

১৯২২ সালে পেশোয়ারের পরে, ব্রিটিশ সরকার আরও দুটি ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করেছিল, একটি কানপুর (১৯২৪) এবং দ্বিতীয়টি মীরাটে (১৯২৯)। মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট সংগঠক যারা ভারতে কাজ করেছেন, যেমন এসভি ঘাটে, এসএ ডাঙ্গে, মুজাফ্ফর আহমদের মতন ব্যক্তিরা। এছাড়া অক্ষয় ঠাকুর, রফিক আহমেদ এবং শওকত উসমানীর মতো দলের অভিবাসী সদস্যরা।

১৯২৪ সালের ১৭ মার্চ এসএ ডাঙ্গে, এম.এন রায়, মুজাফফর আহমদ, নলিনী গুপ্ত, শওকত উসমানি, সিঙ্গারাভেলু চেত্তিয়ার, সৈয়দ গুলাম হুসেন এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তারা কমিউনিস্ট হিসাবে ''ব্রিটিশ ভারতের রাজা সম্রাটকে সম্পূর্ণরূপে তার সার্বভৌমত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। একটি সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন থেকে ভারতের বিচ্ছিন্ন করা''; যাকে বলা হয় কাউনপুর (বর্তমানে কানপুর বানানে) বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা।

এই মামলাটি ভারতে সহিংস বিপ্লব ঘটাতে কমিন্টার্ন পরিকল্পনার প্রতি মানুষের আগ্রহকে আকৃষ্ট করে। 'প্রতিদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি চাঞ্চল্যকর কমিউনিস্ট পরিকল্পনাগুলি ছড়িয়ে দেয় এবং মানুষ প্রথমবারের মতো কমিউনিজম এবং এর মতবাদ এবং ভারতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের লক্ষ্য সম্পর্কে এত বড় আকারে শিখেছিল'।

সিঙ্গারাভেলু চেত্তিয়ার অসুস্থতার কারণে মুক্তি পেয়েছেন। এম.এন. রায় দেশের বাইরে থাকায় তাকে গ্রেফতার করা যায়নি। গুলাম হোসেন স্বীকার করেছেন যে তিনি কাবুলে রুশদের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছিলেন এবং তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল। মুজাফফর আহমেদ, শওকত উসমানি ও ডাঙ্গেকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই মামলাটি ভারতীয় জনসাধারণের কাছে সক্রিয়ভাবে কমিউনিজমকে পরিচিত করার জন্য দায়ী ছিল।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (Meerut Conspiracy Case) ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯২৯ সালে ভারতে শুরু করা একটি বিতর্কিত বিচার, যেখানে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতা সহ ৩১ জনকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই মামলায় তিনজন ব্রিটিশ নাগরিকও ছিলেন, যাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১-এ ধারা অনুযায়ী ''রাজার সার্বভৌমত্ব হরণ'' করার চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করা, কিন্তু এর ফলে উল্টে এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয় এবং আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। শুরু ও সমাপ্তি : ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ মামলা শুরু হয় এবং ১৯৩৩ সালের ৩রা আগস্ট এর বিচার শেষ হয়। ভারতীয় এবং তিনজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতা (যেমন এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফফর আহমেদ, বি.এফ. ব্র্যাডলি, পি. স্প্র্যাট) সহ মোট ৩১ জন। অভিযোগ : ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ''ষড়যন্ত্র'', ''ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উৎখাত'' করার পরিকল্পনা এবং শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত করা। ব্রিটিশ শাসনের দমনমূলক নীতির প্রতীক হিসেবে এটি পরিচিতি পায় এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করে। ফলাফল: অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়, তবে এই মামলা ভারতের বামপন্থী আন্দোলনকে একটি নতুন মাত্রা দেয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করে। এই সময়ের মধ্যে আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

প্রথমত, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়, যদিও তাতে জাতীয়তাবাদীদেরই সার্বিক প্রধান্য ছিল। কিন্তু সাম্যবাদে বিশ্বাসী তরুণরা এই সংগঠনের মধ্যে কাজ শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস মঞ্চে ১৯২৫ সালে কানপুর অধিবেশনে সাম্যবাদে বিশ্বাসী দুই ব্যক্তি যথাক্রমে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ও মৌলানা হসরত মোহানি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ওই প্রস্তাব যদিও পরাস্ত হয়, কিন্তু বহু জাতীয়তাবাদী তাঁদের আনীত এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

তৃতীয়ত, ১৯২২সালে মস্কোতে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভ্লাদিমির লেনিন পরাধীন দেশ ও উপনিবেশসমূহের জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত থিসিস পেশ করেন। এই থিসিসের উপর মানবেন্দ্রনাথ রায় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনেন যা পরাস্ত হয়।

লেনিন তাঁর থিসিসে এই বিশ্লেষণ করেছিলেন যে নির্যাতিত দেশ ও উপনিবেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থানের জন্য একটি প্রগতিশীল ভূমিকা থাকে। ওই সব দেশগুলির কমিউনিস্টদের উচিত তাদের নিজ নিজ দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মঞ্চটিকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে ব্যবহার করা ও মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা। অপরদিকে রায়ের বক্তব্য ছিল এই যে আমাদের সময়ে আমরা তিনটি বিপ্লব দেখেছি যথা ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব, ফ্রান্সের বিপ্লব ও রাশিয়ার নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রথম দুটি বিপ্লবে বুর্জোয়ারা নেতৃত্বে থাকায় সেখানে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির পার্টি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ায় জারের শাসনের অবসান হয়ে সেই দেশ সমাজতন্ত্র অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে জ্জ অতএব ভারতের কমিউনিস্টদের উচিত বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক না 'রেখে এককভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও কংগ্রেসের প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা। কমরেড রায়ের বক্তব্য ছিল অতীব চমকপ্রদ এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর মেধার জন্য কমরেড লেনিন তাঁর থেকে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট এই ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতাকে বলতেন পুবের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলগ্ন থেকে 'কংগ্রেস' দলটি সম্পর্কে পার্টির অধিকাংশের মতবাদ কমরেড রায়ের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯২২ অনুষ্ঠিত) আগেই বোম্বাইয়ের তরুণ কমিউনিস্ট শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ' গান্ধি ভার্সাস লেনিন ' পুস্তকটি ১৯২০ সালের এপ্রিলে রচনা ও প্রকাশ করেন। কী বক্তব্য ছিল এই পুস্তকের দেখা যেতে পারে। গান্ধি সমস্ত দুর্দশার জন্য দায়ী বর্তমান আধুনিক সভ্যতা, শিল্পোন্নয়ন, শোষণ ও তার ফলে অমানবিকতা, অনাহার। লেনিন ধনিক শ্রেণি কর্তৃক উৎপাদনের মালিকানা দখল, বর্ণবৈষম্য, শোষণ ও তার ফলে মহিলাদের দুর্দশা বৃদ্ধি। সংক্ষেপে গান্ধি ও লেনিন উভয়েরই লক্ষ্য এক। এ যুগের সমস্ত সামাজিক অন্যায়কে ধ্বংস করা। বিশেষ করে গরিবদের দুর্গতি নাশ করা এবং স্বৈরাচারের পতন ঘটানো।'

যাই হোক, ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কমিউনিস্টরা কানপুর সম্মেলনের মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই মঞ্চ থেকেই ভারতের মাটিতে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এর সম্পাদক এস ভি ঘাটে, সভাপতি সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, এস এ ডাঙ্গে কারাগারে বন্দি। তিনি সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য হন। ওই একই সময় ওই শহরে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আগত কমিউনিস্টরা কংগ্রেস অধিবেশনেও যোগ দেন।

বোম্বাইয়ে সুতোকল শ্রমিক ও কলকাতা সংলগ্ন বজবজ, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি অঞ্চলে কমিউনিস্টরা শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯২৮ সালে বোম্বাইতে সুতোকল শ্রমিকরা ছয় মাসের জন্য ঐতিহাসিক ধর্মঘট করে যা সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ওই বছরেই ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষদিনে এক বিশাল শ্রমিক মিছিল পূর্ণ স্বাধীনতা' র প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে এই দাবিতে সম্মেলন স্থল অবরোধ করে। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্টরা জ্জ গান্ধিজি এসে এই মিছিলে প্রতিশ্রুতি দেন, এক বছর অপেক্ষা করার পরও যদি ব্রিটিশ সরকার স্বশাসনের দাবি না মানে , তাহলে আগামী বছর ১৯২৯ এ অনুষ্ঠিতব্য লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।

ওই ১৯২৯ এ আতঙ্কিত ব্রিটিশরাজ সারা দেশের ৩২ জন সাম্যবাদী যুবককে গ্রেফতার করে 'মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করে।

উপরোক্ত ঘটনাবলি থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রধান মঞ্চ কংগ্রেসে ও শ্রমিক সংগঠনে (টি ইউ সি) যোগ দিয়ে এক দশকে কমিউনিস্টরা দ্রুত তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। খুবই কঠোর, কঠিন ও গোপনীয়তার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হত। একই সঙ্গে জনসাধারণের উপর জাতীয় নেতৃত্বের যে সুবিশাল প্রভাব ছিল তা অতিক্রম করার জন্য তাঁদের সর্বদা মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হত। মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা দেশবাসীর মধ্যে

কমিউনিস্টদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও গণভিত্তি প্রসারের সহায়ক হয়। স্বয়ং গান্ধিজি মিরাট জেলে গিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর ফলে দেশবাসীর মনে কমিউনিস্ট দের সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয় । জওহরলাল কমিউনিস্টদের মুক্তির জন্য পিতা মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে ' মিরাট সহায়ক কমিটি ' গঠন করেন। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও রক্ষণশীল শক্তি যথেষ্ট প্রভাবশালী হলেও কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কমিউনিস্টদের নিজস্ব মতাদর্শগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

১৯৩০-১৯৩১ সালে কংগ্রেস সম্পর্কে কমিউনিস্টদের রণকৌশল কী হবে তা নিয়ে পার্টির মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য শুরু হয়। কমিউনিস্টদের একটি অংশ এআইটিইউসি থেকে থেকে বেরিয়ে এসে ' রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ' গঠন করেন জ্জ পার্টি নেতৃত্বের একটি বড় অংশ মিরাট মামলার সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাবন্দি। ফলত পার্টির ঐক্য বিনষ্ট হয়ে সারা দেশে তাঁরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৩০-৩২ সালে লবণ আইন অমান্য ও আইন অমান্য আন্দোলনে অনেকে অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিতে যোগ না দেওয়ার জন্য কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইউরোপে তখন নাৎসি মতবাদের প্রধান্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফ্যাসিবাদের উত্থান ও অক্ষশক্তি (রোম, বার্লিন, টোকিও, অ্যাক্সিস) গঠিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে কমিনটার্নের পক্ষ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রজনীপাম দত্ত ও বেন ব্র্যাডলেকে ভারতে কমিউনিস্টদের আশু কর্তব্য কী এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দুই নেতা ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে কমিনটার্ন - এর কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ থিসিস দেন। এই থিসিস দত্ত-ব্রণ্ড্যাডলে থিসিস বলে খ্যাত। এই রিপোর্টে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পার্টি গ্রুপগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী পার্টি গঠন করার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে সুপারিশ করা হয় যে কমিউনিস্টরা যেন কংগ্রেসের মধ্যে থেকে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। দত্ত-ব্র্যাডলে থিসিস অনুযায়ী ১৯৩৩ সালে পার্টি পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৩৩ সালে এই ঐক্যবদ্ধ পার্টির সম্পাদক হন বোম্বাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে। তিনি এক বছর পর গ্রেফতার হলে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সোমনাথ লাহিড়ী। তিনি ১৯৩৫ সালে গ্রেফতার হলে পার্টির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন পুরণচাঁদ যোশি।

১৯৩৬ সালে লখনউ কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমিনটার্নের নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেয়। পার্টির উদ্যোগে কংগ্রেস অধিবেশনে কৃষকসভা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রমিক সংগঠন করা শিল্পাঞ্চলের কংগ্রেস কর্মীদের কর্তব্য বলে নির্দেশিত হয়। গান্ধিজি নিজে কমিউনিস্টদের কংগ্রেসে যোগদানকে স্বাগত জানান। এই অধিবেশনের আগে পার্টির সম্পাদক পি.সি জোশি গান্ধিজি'র সঙ্গে সাক্ষাত করেন। গান্ধিজি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষারত জোশির কাছে এসে নমস্কার করে বলেন 'আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। জওহরলালের কাছে আমি আপনার কথা শুনেছি জ্জ আমি আপনার কাছে সাম্যবাদের পাঠ গ্রহণ করতে চাই। " জোশি লিখেছেন ভারতের কোটি কোটি জনতার কাছে যিনি ঈশ্বরস্বরূপ তিনি একজন যুবার সঙ্গে ওইরকম আন্তরিক ও সম্মানজনক ব্যবহার করবেন তা ছিল অপ্রত্যাশিত।

গান্ধিজি তাঁকে বলেছিলেন, কমিউনিস্টদের উচিত কংগ্রেসের মধ্যে থেকে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মতাদর্শগত প্রচার চালিয়ে কংগ্রেসকে তাদের পথে নিয়ে যাওয়া । কমিউনিস্টরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর এই কালপর্বে গড়ে ওঠে কৃষকসভা , গণনাট্য সঙ্ঘ, প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি গণ সঙগঠন । বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে । বাংলা, পাঞ্জাব ও অন্য অঞ্চলের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির বিরাটসংখ্যক রাজবন্দি আন্দামান সেলুলার জেল, দেউলি ও অন্যান্য কারাগারে ও Detenue ক্যাম্প এ 'কমিউনিস্ট কনসলিডেশন ক্যাম্প' গঠন করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পার্টির গণভিত্তি প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু গত শতকের চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি একটি গুরুতর ভ্রান্তির ফলে দেশের জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মূল ধারা থেকে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(ক্রমশ)

নাগরিক -এর সকল পাঠক ও লেখককে জানাই
শুভ ইংরেজি নববর্ষে প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
সম্পাদকমণ্ডলী
নাগরিক

ধারাবাহিক

জরুরি অবস্থার পরবর্তী পরিস্থিতি ও সিপিআই দলের পতনের সূচনা

সুশান্ত দাশগুপ্ত

(৯)

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাঞ্জাবের ভাতিন্ডায় সিপিআই-এর একাদশ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই পার্টি কংগ্রেস ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জরুরি অবস্থা সমর্থন সঠিক ছিল কিনা তাই নিয়ে পার্টিতে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছিল। পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত করার জন্য রিভিউ রিপোর্টটি প্রস্তুত করতে পার্টির সাধারণ সম্পাদক সি রাজেশ্বর রাও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহিত সেনকে দায়িত্ব দেন। মোহিত সেন যে রিপোর্টটি প্রস্তুত করেন, সেই রিপোর্টে তিনি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল যথা বিধানসভাগুলি ও লোকসভা বাতিলের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহের ডাক দেওয়া প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন। মোহিত সেন তাঁর খসড়ায় বলেন, জরুরি অবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন বাধ্যতামূলক পরিবার পরিকল্পনা, শহর সৌন্দর্যায়নের নামে বস্তি উচ্ছেদ প্রভৃতি বাড়াবাড়ি শুরু হয় তখন শুধুমাত্র সমালোচনা ও কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলনের মধ্যে পার্টির ভূমিকা সীমাবদ্ধ না রেখে প্রকাশ্যেই জরুরি অবস্থার প্রত্যাহারের দাবি জানানো উচিত ছিল। রিপোর্টটি সম্পাদকমণ্ডলীতে রাজেশ্বর রাওসহ অধিকাংশ সদস্য সমর্থন করেন। যদিও ভূপেশ গুপ্ত একটি বিকল্প রিপোর্ট দেন। রিপোর্টটি সাধারণ সম্পাদক এরপর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহীতে আলোচনার জন্য পেশ করেন। এর বিপরীতে ভূপেশ গুপ্তর বিকল্প প্রস্তাবটিও পেশ করা হয়। তাতে বলা হয় জরুরি অবস্থা সমর্থন করাই ছিল মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। ভূপেশ গুপ্ত তাঁর রিপোর্টে একথাও বলেন যে কংগ্রেস ভারতীয় 'বুর্জোয়াদের বৃহত্তম সংগঠন। সুতরাং কংগ্রেসই প্রধান বিপদ। কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনার সময় রাজেশ্বর রাও ও তাঁর অনুগামীরা অবস্থান পরিবর্তন করেন।

মোহিত সেন তাঁর 'ট্রাভেলর অ্যান্ড দি রোড, জার্নি অব অ্যান ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট' গ্রন্থে লিখেছেন তিনি পার্টি সম্পাদক রাজেশ্বর রাও - এর সঙ্গে তার আলোচনায় খুবই তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করেন যে তিনি (রাজেশ্বর রাও) যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা পার্টির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ এবং এই সিদ্ধান্ত হবে কমিউনিস্ট পার্টির অবলুপ্তিকরণের প্রক্রিয়ার শুরু মাত্র। মোহিত সেনের মতে, সিপিআই ভারতের সুস্পষ্ট অগ্রগতির পক্ষে যে ভূমিকা পালন করেছিল এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত এই সিদ্ধান্তের ফলে তার বিলুপ্তি ঘটল। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের এর ফলে শক্তিবৃদ্ধি হবে এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। পার্টিগতভাবে সিপিআই,সিপিআই(এম)-এর লেজুড়ে পরিণত হবে। মোহিত সেন বলেন, একটি দেশে একাধিক কমিউনিস্ট পার্টি যদিও বা থাকতে পারে, কিন্তু দুটি সিপিআই(এম) থাকা সম্ভব নয়। রাজেশ্বর রাও খুবই বিরক্তির সঙ্গে মোহিত সেনের কথাগুলি শোনেন ও প্রায়ই অধৈর্য হয়ে ওঠেন। তিনি মোহিতকে অধৈর্য ও অবাধ্য হতে বারণ করেন। তিনি বলেন, অনেকেই যখন নতুন করে চিন্তা করছেন তখন তারও (মোহিতের) নতুন করে ভাবা উচিত। মোহিত যাতে কোনওভাবেই এস.এ. ডাঙ্গের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত না হন রাজেশ্বর রাও সে বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। মোহিত সেন লিখেছেন রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে ওই টিই ছিল তার শেষ খোলাখুলি আলোচনা। রাজেশ্বর রাও এই পর্যায়ে আরো অনেক কমরেড এর সঙ্গেই আলোচনা শুরু করেন যাতে তাঁরা কোনও ভাবেই কম. ডাঙ্গের মতন একজন ' শ্রেণি - সমঝোতাকারীর ' সঙ্গে একমত না হন। এস এ ডাঙ্গে এই পর্যায়ে, মোহিত সেন উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, ডাঙ্গে যে সকল কমরেড তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন তাঁদের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সঠিক অবস্থানের জন্য ধন্যবাদ জানান। কিন্তু ডাঙ্গে একথাও বলেন যে পার্টি শিক্ষার (Party Education) ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ কমরেডই স্বাধীনভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নন। 'অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতা'র লাইন গ্রহণ করা অধিকাংশের কাছেই অপেক্ষাকৃত সহজ। কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য ও সংগ্রামের' দ্বান্দিক লাইন গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। ডাঙ্গে আবারও তাঁর অধিক বয়সজনিত অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেন, কুড়ি বছর আগে তিনি যে পরিশ্রম করতে পারতেন এখন তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি রাজেশ্বর রাওয়ের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কথা বলে একই সঙ্গে তাঁর (রাজেশ্বর রাও) সাংগঠনিক ও গোষ্ঠী রাজনীতি করার দক্ষতার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সিআর-এর এই শক্তিটিকে ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই। ডাঙ্গে কোনও নতুন পার্টি করার কথাও আদৌ এই সময়ে ভাবেননি ভাতিন্ডা কংগ্রেসের অধিবেশনে দেখা গেল অধিকাংশ সদস্যই চরম কংগ্রেস বিরোধিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর মনে করছিলেন জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। তাঁরা মনে করেছিলেন পার্টিকে চরম কংগ্রেস বিরোধিতায় শক্তিশালী লাইন গ্রহণ করতে হবে ও অন্যান্য বামপন্থী

দলের বিশেষ করে সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। রাজেশ্বর রাও সেই সময়ে 'শ্রেণি স্বাধীনতার' (Class Independence) শ্লোগান দেন ও বলেন কংগ্রেসকে পরাস্ত না করে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের অগ্রগতি হবে না। রাজেশ্বর রাও ও তাঁর সম মতাবলম্বীরা এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে কোনও মার্কসবাদ - লেনিনবাদ সম্মত বিশ্লেষণের আশ্রয় নেননি। তাঁদের কাছে এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রে একটিই আলোকবর্তিকা ছিল তা হল ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাস্ত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল রাজেশ্বর রাও, ভূপেশ গুপ্ত থেকে শুরু করে বিশ্বনাথ মুখার্জি, সৎপাল ডাং, কেউই ' জরুরি অবস্থা ' জারি করার সময় তার বিরোধিতা করেননি। কিন্তু ভাতিন্ডা কংগ্রেসে জরুরি অবস্থা সমর্থন ভুল ছিল এই সিদ্ধান্তে আসার সময় কোনও আত্মসমালোচনা হল না। আত্মসমালোচনা করলে তাদের পাছে নেতৃত্ব ছাড়তে হয়।

ভাতিন্ডা কংগ্রেসে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সি অচ্যুত মেনন অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। তিনি একটি লিখিত বক্তব্য পাঠান। তাতে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য ইন্দিরা গান্ধির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর এই চিঠি রাজেশ্বর রাও, ভূপেশ গুপ্ত , বিশ্বনাথ মুখার্জিদের শক্তিবৃদ্ধি করে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় অচ্যুৎ মেনন কেরলের সিপিআই- কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্জ তাঁর মন্ত্রিসভা (১৯৭০-৭৭) বহু প্রশংসনীয় সংস্কারের কাজ করেছিল এবং সর্বদাই ইন্দিরা গান্ধির সমর্থন লাভ করেছিল। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে কেরলে সিপিআই-কংগ্রেস জোট বিপুলভাবে জয়লাভ করে।

অতীতে অচ্যুৎ মেনন কখনই পার্টি অভ্যন্তরে জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করার বিরোধিতা করেননি বা তা সমর্থন করা ভুল হয়েছিল এমন কথা বলেননি। সম্ভবত তিনি এখন দেরিতে হলেও তা বলেন তার কারণ তিনি একজন 'ডেমোক্র্যাট' বলে তাহলে প্রশংসিত হবেন। তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের কোনও অভিযোগই ছিল না। তাঁর এই অকস্মাৎ মত পরিবর্তন কিন্তু তাঁকে কোনও কৃতিত্ব দিল না। স্বয়ং ই এম নামবুদ্রিপাদ তাঁকে তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন এই বলে যে 'মেনন এই অবস্থান নিয়েছেন তা লাভজনক হবে বলে।' ডাঙ্গে জরুরী অবস্থা সমর্থন বিষয়ে তাঁর মতে অবিচল ছিলেন। ভাতিন্দা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এস এ ডাঙ্গে পরবর্তী সময়ে ১৯৮০ সালে বলেছিলেন এই সিদ্ধান্ত পার্টিকে অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাবে এবং পার্টি অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের নর্দমা দিয়ে বয়ে যাবে। (ক্রমশ)

স্মরণ

খালেদা জিয়া

চলে গেলেন খালেদা জিয়া।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন তিনি। তার মৃত্যুদিন চিরকাল এদেশে সন্দেহের চোখে দেখা হবে জ্জ তারেক জিয়াকে অনেক শর্ত মেনে দেশে আসতে হয়েছে। কবে খালেদা জিয়া মারা যাবেন, তার জানাজা কবে হবে- সেটি গেইম মেকাররা ঠিক করেছে। অতীতের গেইম মেকাররা যেমন ঠিক করেছিল ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হবার দিনটি হোক একটি জন্মদিনের আনন্দ উৎসব এদেশের এন্টি-মুক্তিযুদ্ধ, পরাজিত শক্তি, এন্টি-আওয়ামী লীগারদের জন্য ১৫ আগস্ট 'নাজাত দিবস'। ফলে সেই দিন যদি খালেদা জিয়া জন্মদিন পালন করে তাহলে সেই সমর্থকগোষ্ঠিরা পৈশাচিক আনন্দ লাভ করবে। ১৫ আগস্টের দিন ৩২ নম্বরে সাইন্ড বক্সে লুঙ্গি ড্রান্স গানের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য দেশের সেই বিভাজনের নগ্ন হস্তক্ষেপ।

খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি ঠিক নামাজকালাম পড়া নারী ছিলেন না। হুজুরদের ভাষায় পর্দা বলতে যা বুঝায় তিনি সেটি করতেন না। তবু তিনি এদেশের ইসলামিক গোষ্ঠির কাছে প্রিয় ছিলেন। এটিও তার বিশেষ কোন যোগ্যতা ছিল না। ফাতেমা জিন্নাহ যখন নির্বাচন করলেন তখন পুরো পাকিস্তানের আলেমরা তাকে সমর্থন জানালো। আলেমরা ফতোয়া দিলো, বড় পাপকে রুখতে গিয়ে ছোট পাপ জায়েজ আছে। বড় পাপ হচ্ছে আইয়ুব খান যিনি মুসলিম পার্সনাল ল' সংস্কার করেছিলেন। আলেম ওলামাদের তাই আইয়ুবের প্রতি ক্ষোভ ছিল, তাকে ইসলামের দুশমন আখ্যা দিয়েছিল। তাই ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম জেনেও আলেমরা ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেছিল যেন আইয়ুবের পরাজয় ঘটে। হুজুরদের খালেদা জিয়াকে সমর্থনও ছিল যেন মুজিব কন্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়।

খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার যে ধারাবাহিকতা ছিল সেটাই ধরে রেখেছিলেন। তার শাসনকালেও পাকিস্তানকে সরকারী গণমাধ্যমে স্রেফ 'হানাদার বাহিনী' বলা হতো, পাকিস্তান শব্দটা উহ্য রাখা হতো। মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিব বলতে যে একজন আছেন সেটি স্বীকার করা হয়নি। জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান না করে শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করা কি মুজিবের প্রতি জিয়ার ক্ষোভ ছিল? সেই একই ক্ষোভ খালেদা জিয়ারও ছিল? সামান্য একটি ঘটনার জন্য তো খালেদা জিয়া চিহ্নিত রাজাকার আল বদরদের মন্ত্রী

বানাতে পারেন না? আসলে এখানেও রাজনীতি। মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ এই যে জনসমর্থন তা ছিল পুরো বাংলাদেশের জনগণের সমর্থন। সাড়ে তিন বছরের মুজিব শাসন ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে ম্যাজিক্যাল একটি শাসন ও সফল একটি সরকার। কিভাবে? কারণ ব্যাংকে একটি টাকাও নেই। সব পুড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। দেশের কোন ব্রিজ রাস্তা অক্ষত ছিল না। আন্তর্জাতিক দাতা শক্তি ছিল বাংলাদেশ বিরোধী। বাংলাদেশের কাছ থেকে কেউ কিছু কিনবে না সেরকম অঘোষিত আন্তর্জাতিক নির্দেশ ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ, অর্থনীতি শূন্য, সেই অবস্থা থেকে একটি দেশ নতুন করে গঠন করাকে কি আপনি বাংলাদেশের অন্য কোন শাসনকে তুলনা করে এগিয়ে রাখতে পারবেন? ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবার সময়ও ভারত ছিল অক্ষত। কিন্তু পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলা ছেড়ে যাবার আগে সব ধ্বংস করে গিয়েছিল। ৭৫ সালে বাংলাদেশে একটি রাস্তাও পাওয়া যায়নি যা ব্যবহার করা সম্ভব। ১৩২টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করা গেছে।... যাক এটি বঙ্গবন্ধুর শাসনামল নিয়ে লেখার সময় নয়। বলছিলাম খালেদা জিয়ার কথা...

মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনকে যদি বলি চরম ব্যর্থ তবু সে কারণেই কি করে বিএনপির মত একটি সেনা ছাউনি থেকে জন্মানো দল দেশের অর্ধেক মানুষের দল হয়ে উঠল? কারণ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া ও পাকিস্তান ভাঙার পর আওয়ামী লীগের এন্টি ভোট এখানে তৈরি হয়েছিল অটোমেটিক। তাদের ভোট পেতে তাই খালেদা জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যেতে হয়েছে। তাকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বলতে হয়েছে। কোন জাতীয় পর্যায়ে তার মত নেত্রীকে বলতে শুনেছি, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে কুরবান থাকবে না, মসজিদে উলো ধ্বনি হবে, ভারত দখল করে নিবে...।

খালেদা জিয়া তবু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম হয়ে থাকবেন। ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকার জন্য। কিন্তু ২০০১ সালের পর খালেদা জিয়া পুত্র তারেক জিয়াকে রীতিমত রাজতন্ত্রের মত উত্তরাধিকার মনে করলেন। ১৭ বছর আগের তারেক সম্পর্কে আমরা জানি পাকিস্তাপূর্বনের আইএসআই ঘনিষ্ঠ। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ছিল সেই আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। বলতে গেলে সেদিনই বাংলাদেশের কপালে স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হলো। তারেক জিয়াকে মুচলেকা দিয়ে রাজনীতি ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিতে হলো। মাইনাস টু বাস্তবায়নে সুশীল চক্র প্রথম অরাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পক্ষপাত করতে কেএস হাসানকে প্রধান বিচারপতি বানানোর পরই প্রকৃত অর্থে নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশে জালিয়াতির শুরু। এরপর হাসিনার ১৭ বছর ছিল এর ধারাবাহিকতা। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে গ্রেনেড মেরে হত্যা করা, ভারতের বিচ্ছন্নতাবাদীদের জন্য অস্ত্র খালাস করা- বাংলাদেশের রাজনীতিতে অশুভ ছায়া এনে ফেলেছিল খালেদা জিয়ার শাসনেই।

খালেদা জিয়া হতে পারতেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির আরেকটি বিকল্প। তিনি মোল্লাদের সামনে কোমড় বাঁকা করে দাঁড়াতেন না। পা তুলে বসতেন। কিন্তু ধর্মের কার্ড খেলে গেছেন অবিরাম। তা কেন না এদেশে তা খেলেছে? মদ নিষিদ্ধ ছিল সেরকম একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। জিয়া, এরশাদ, হাসিনা সবাই ধর্মের কার্ড খেলেছে।

আজ তিনি সব কিছুর উর্ধে। এইভাবে সবাই একদিন সব কিছুর উর্ধে চলে যাবো। এখনো শেখ হাসিনা জীবিত এটি আমাদের কাছে স্বস্তির কারণ। শেখ হাসিনা কেবল তার দলের জন্য না, বাংলাদেশের কান্ডারী হতে হবে। সেটি করতে গেলে অতীতের সব রাগ ক্ষোভ ভুলে যেতে হবে। এটা শুরু হতে পারে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদে শেখ হাসিনার শোক প্রকাশের মাধ্যমে। আপাতত বিএনপি আওয়ামী লীগের শত্রু না। বিএনপি তথা তারেক জিয়াকে মানতে হবে আওয়ামী লীগ তাদের শত্রু না। পৃথিবীতে সব দেশেই দুটি প্রধান দল থাকে। সেসব দেশে কোনও প্রথম আলোর মত দালাল এজেন্ট মিডিয়া থাকে না যারা 'বিকল্প দল' নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র করে। এটি করতে গেলে কতবড় নৈরাজ্য শুরু হয় সেটি জনগণ আশা করি বুঝেছে। কাজেই খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পরবর্তী আমি মনে করি আওয়ামী লীগ বিএনপির শত্রু নয়, দেশের জন্য তারা দুটি দলই কান্ডারী এই রকম মনোভাব আনতে হবে। আমরা সেটিই দেখতে চাই।

খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুযুপ্ত পাঠক - এর ওয়াল থেকে গৃহীত।

দেশের খবর

অসমের কার্বি পাহাড়ের জন বিক্ষোভ এক অশনি সংকেত

কমলেশ গুপ্ত

বছরের শেষ সপ্তাহে অসমের পশ্চিম কার্বি আংলঙ জেলার খেরণি অঞ্চল বিক্ষোভ আন্দোলনে আক্ষরিক অর্থেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার 'অসম এখন আন্দোলনমুক্ত , প্রতিবাদ শূন্য' অশান্তি নেই হিংসা নেই এমন দুঃসাহসিক দম্ভোক্তি আবারো

ধুলোয় মিশিয়ে ঐ জেলায় শান্তিপূর্ণ অনশন হয়ে ওঠে হিংসাত্মক। হিংসার দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলছে কার্বি পাহাড়ের জেলা দুটো। বেশ কয়েকদিন ধরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে দুই জেলার ইন্টারনেট। পশ্চিম কার্বি আংলঙ জেলায় পুলিশের নির্বিচার গুলিতে লিনুস ফাংসে নামক এক কার্বি যুবক নিহত হয়েছে এবং তিন কার্বি যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছে। কার্বি প্রতিবাদকারীরা খেরণিতে অ-কার্বিদের বাড়ি ঘর , জীবিকার একমাত্র অবলম্বন দোকান পাট, যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয়াতে অসহায় ভাবে আবদ্ধ হয়ে সবুজ দে নামে এক দিব্যাঙ্গ বাঙালি যুবক জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়।সব মিলিয়ে চরম উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজমান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চ, পুলিশের ডিআইজি হরমীত সিং এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনীর টহল চলছে। মোতায়েন হয়েছে বিশাল সিআরপি বাহিনী।

উল্লেখযোগ্য যে শান্তিপূর্ণ ভাবে আমরন অনশনে বসা যুবকদের নেতা লিটসং রংফার সহ ছয় জন যুবককে গত ২২ ডিসেম্বর শেষ রাতে অনশন মঞ্চ থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গুয়াহাটি এবং নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু খবর প্রচারিত হয় যে অনশন কারীদের পুলিশ গ্রেফতার করে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে।এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার কার্বি জনতা পথে নামে এবং বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরবর্তীতে এই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং উত্তেজিত জনতা অ-কার্বিদের বাড়ি ঘর, দোকান পাটে আক্রমণ চালায় এবং লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ করে। এমনকি বিক্ষোভ কারীদের একটি দল বিজেপি শাসিত কার্বি আংলঙ স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং এর বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়। উত্তেজনা এবং উপদ্রব জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিসংযোগ এবং সবুজ দের মৃত্যু কে কেন্দ্র করে বিহারী এবং বাঙালিদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায়।শত শত মানুষ হাতে লাঠি সোটা নিয়ে ,'জয় শ্রী রাম' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। দুপক্ষের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এদিকে তুলিরাম রংহাংএর বাসগৃহে অগ্নিসংযোগের পর তাঁরই নির্দেশে বাড়ির অবশিষ্টাংশ পরদিনই ছয় ছয়টা বুলডোজার চালিয়ে পরিস্কার করে ছাইপাশ এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।এই অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে কি এবাড়িতে অবৈধ অস্ত্র অথবা নিষিদ্ধ কিছু ছিল যা গোপন বা আড়াল' করতেই এই তৎপরতা? তদন্তের সুযোগ না দিয়ে সব প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা?

কার্বি পাহাড়ে বিগত সময়ে যা ঘটেছে অনেকে এটাকে শ্রীলঙ্কা, নেপালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলতে চাইছেন ! আসলে শাসকের বাসগৃহে শাসিতের আক্রমণের ঘটনাকে কেবলমাত্র আইনশৃংখলা জনিত বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলে ঢেকে রাখা যায় না। মানুষের ক্ষোভ অন্ধ, কিন্তু চেতনা অন্ধ নয়। প্রকল্প এবং উন্নয়নের চমকে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখতে পারা গেছে বলে সরকার মনে করলেও কার্বি আংলঙের ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মানুষের ক্ষোভ যা তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল একটুখানি দমকা হাওয়া পেয়ে লেলিহান শিখায় পরিনত হয়েছে শাসকদের বিরুদ্ধে।

কার্বি আংলঙের ঘটনা বিচ্ছিন্ন বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়।সেই এ এস ডি সি আমল থেকেই জনসাধারণ লক্ষ্য করেছে শাসকদের স্বরূপ।যখন কার্বি জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ কঠিন দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করছিল, সেসময় শাসকেরা দুহাতে রাজকোষ লুট করেছে, প্রাসাদোপম বাড়ি ঘর বানিয়েছে, সম্পদের পাহাড় গড়েছে, বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে।লুটের ভাগ পেয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের সকল স্তরের সরকারি আমলারা।প্রায় দেড়-দুই দশক ধরে চলা ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের সময় ভুগেছেন সাধারণ মানুষ,নেতারা কেবলই দল পাল্টে পাল্টে গদি দখল করার খেলায় মত্ত থেকেছে। এতোদিন এই লুণ্ঠনকারীরা শুধু উন্নয়নের টাকা বা সম্পদ লুটপাট করেছে। এখন তাদের চোখ পড়েছে পাহাড়ের মাটি আর সম্পদের ওপর। শাসকেরা পাহাড়ের ওপরের জমি, বনজ সম্পদের সাথে মাটির নিচের খনিজসম্পদ কুক্ষিগত করতে পথ দেখিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন আদানি-আমবানির মতো পুঁজিপতিদের।কার্বি পাহাড়ের মানুষের মূল ক্ষোভ সাধারণ অ-কার্বি মানুষের ওপর নয়। তাদের ক্ষোভ অবৈধ দখলদারদের ওপর। যারা ধীরে ধীরে ঐ জনগোষ্ঠীর আবাসভূমিতে লুণ্ঠনের হাত প্রসারিত করেছে। কিন্তু লুণ্ঠনের আসল ছবিটি ঢেকে রেখে ক্ষমতায় থাকা চক্রটি ঐ জেলায় গোষ্ঠীগত বিভাজনের উস্কানি দিয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতেও শাসকদের প্রতি কার্বি জনগোষ্ঠীর ক্ষোভকে গোষ্ঠী বিদ্বেষে রূপান্তরিত করতে একাংশ সুযোগ সন্ধানী চক্রান্ত করছে,এমন অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু কার্বি পাহাড়ের লুণ্ঠন লুকিয়ে রাখা সহজ নয়। মানুষের আসল ক্ষোভ ছদ্মবেশী লুটেরা শাসকদের বিরুদ্ধে। শাসকদের ছাতার তলায় বৃহৎ পুঁজিপতিরা কিভাবে পাহাড়ের বনজ সম্পদ , খনিজসম্পদ, এবং হাজার হাজার বিঘা জমি কুক্ষিগত করছে এই কথাগুলো কার্বি পাহাড়ের মূল চর্চার বিষয়। মানুষের ভেতরে ভেতরে যে ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি রয়েছে এই ঘটনায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ।এমন ইংগিতে পাওয়া যাচ্ছে যে

শোষণের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে এমন অঘটন আর ঘটবে না তা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারছেন না। মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যের বাসগৃহে জনতার আক্রমণের ঘটনা শাসকদের ওপর আস্থাহীনতার প্রতীক বলেই গণ্য হবে। এই সংকেতের মর্ম শাসকশ্রেণী উপলব্ধি করবে তো?

গণপিটুনি: প্রগতির মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা পশুত্ব

সুকুমার মিত্র

ভারতকে আমরা গণতন্ত্রের দেশ বলে গর্ব করি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির উন্নতির গল্পে দেশকে সাজাই। কিন্তু এই চাকচিক্যের আড়ালে বারবার উঁকি দেয় এক ভয়াবহ বাস্তবতা, যেখানে ভাষা, ধর্ম ও পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত করে উশৃঙ্খল জনতার আদালতে একতরফা বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কেরালার পালক্কাদে দলিত যুবক রামনারায়ণ বাঘেলের মৃত্যু, ওড়িশার সম্বলপুরে পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল শেখের হত্যাকাণ্ড এবং ভুবনেশ্বরে বাংলাভাষী রফিকুল শেখের উপর হামলা সবকটি ঘটনা আমাদের সমাজের বিবেককে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি ধারাবাহিক প্রবণতা, যা প্রমাণ করছে 'অপর'-ভাবনার বিষাক্ততা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও বলছে, দেশে গণপিটুনি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে আমাদের প্রগতি কি সত্যিই মানবিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে, নাকি কেবল কাগজে-কলমে উন্নতির গল্প লিখে আমরা নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছি? আর 'মন কি বাত' বলা দেশের প্রধানমন্ত্রী এইসব একের পর এক উদ্বেগজনক ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে দিব্যি রয়েছেন।

কেরালার পালক্কাদের নির্জন প্রান্তরে দলিত যুবক রামনারায়ণ বাঘেলের মৃত্যু আমাদের সমাজের বিবেককে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। কাজের সন্ধানে ভাইয়ের কাছে এসে পথ হারানো এই যুবককে 'চোর' ও 'বাংলাদেশি' সন্দেহে জনতা ঘিরে ধরে নির্মমভাবে পেটায়। পোস্টমর্টেমে দেখা যায় তাঁর শরীরে এক ইঞ্চি জায়গাও আঘাতমুক্ত ছিল না। মোবাইলে ভিডিও করা হয়, কিন্তু কেউ মানবিকতার হাত বাড়ায়নি। এই দৃশ্য আমাদের সামনে এক করুণ দর্পণ তুলে ধরেছে, যেখানে আমরা নিজেদের বিকৃত মুখচ্ছবি দেখতে পাই। একইভাবে ওড়িশার সম্বলপুরে পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল শেখকে আধার কার্ড দেখানো নিয়ে বিবাদের সূত্রে 'বাংলাদেশি' বলে গালাগালি দিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করলেও শ্রমিকদের অভিযোগ স্পষ্ট যে, বাংলাভাষী হওয়ায় তাঁদের লক্ষ্য করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচারের ফলেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। আবার বাংলা বলার অপরাধে বিজেপি-শাসিত ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিক নিগ্রহ। ভুবনেশ্বরে বাড়িতে হানা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে বেধড়ক মারধর করা হল মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার রফিকুল শেখকে। আহত অবস্থায় প্রাণভয়ে রফিকুল ভগবানগোলায় পালিয়ে এসে আপাতত চিকিৎসাধীন।

এই ঘটনাগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে দেশে ১৩টি গণপিটুনির ঘটনা এবং ৫৯টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। মুসলিম, দলিত ও বাংলাভাষী মানুষই প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, 'অপর'কে সন্দেহের চোখে দেখা এবং তাঁকে শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা দেশে ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। সমাজে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সম্প্রদায় বা ভিন্ন রাজ্যের মানুষকে 'বহিরাগত' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা উদ্বেগজনক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক প্রচার ও বিষাক্ত আখ্যান জনতার মধ্যে সন্দেহ ও ঘৃণা ছড়াচ্ছে। বাংলাভাষী বা মুসলিমদের 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে চিহ্নিত করার সংঘ পরিবারের ধারাবাহিক প্রচার জনতাকে এমন জায়গায় ঠেলে দিয়েছে, যেখানে যে কেউ নিজেকে ইমিগ্রেশন অফিসার ও বিচারক মনে করছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিও করে ভাইরাল করার মাধ্যমে হিংস্রতাকে স্বাভাবিক ও বিনোদন হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মানুষ সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না, বরং দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। মানবিকতার এই অবক্ষয়ই গণপিটুনিকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে। বিচারব্যবস্থার দুর্বলতাও এই প্রবণতাকে উসকে দিচ্ছে। অধিকাংশ গণপিটুনির মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। অভিযুক্তরা সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা দুস্কৃতীর দল। পুলিশ অনেক সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও জনতার চাপে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও প্রকৃত ন্যায়বিচার হয় না, ফলে ভুক্তভোগীর পরিবার কোনও সান্ত্বনা পায় না।

ভারতকে 'বিকশিত' বা 'প্রগতিশীল' বলা হলেও বাস্তবে সমাজে ভাষা, ধর্ম ও পরিচয়ের ভিত্তিতে হিংস্রতার প্রবণতা ও বর্বরোচিত

ঘটনা বেড়ে চলেছে। প্রতিটি ঘটনার পিছনে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের চেহারাগুলি ক্যামেরাবন্দী দেখা গেলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কোথায়? কেরালায় ছত্তিশগড়ের রামনারায়ণ বাঘেল ও ওড়িশায় পশ্চিমবঙ্গের জুয়েল শেখ খুন ও রফিকুল শেখের উপর নৃশংস প্রাণঘাতী হামলা আমাদের সামনে এক হতাশার চেহারা তুলে ধরেছে। যদি আমরা নিজেদের বিকৃত মুখচ্ছবি দেখতে না পাই, তবে আমাদের প্রগতি কেবল ধোঁকা। গণপিটুনি মামুলি কোনও অপরাধ নয়, এই ঘটনা সমাজের মৌলিক মানবিকতার অবক্ষয়ের প্রতিফলন। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক প্রচারের বিষাক্ততা দূর করা এবং 'অপর'-ভাবনার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া এই প্রবণতা থামানো যাবে না। আমাদের প্রগতি, বিকাশ ও স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হবে। প্রশ্ন উঠছে কবে দেশের সংখ্যালঘু, দলিত ও বাংলায় কথা বলা মানুষ নিশ্চিন্তে বলতে পারবে;'আমরা নিরাপদ।'

ক্ষতিপূরণ বা রাজনৈতিক দায় চাপাচাপি নয়, প্রয়োজন প্রকৃত ন্যায়বিচার এবং সামাজিক সচেতনতা। আমাদের সমাজকে গেরুয়াবাহিনীর এই বিষাক্ত 'অপর'-ভাবনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, নইলে ইতিহাস বারবার লজ্জায় নতশির হবে। ধর্মনিরপেক্ষগন্ধ আধুনিক দেশে প্রগতি, বিকাশ ও স্বাধীনতার আসল মানে তখনই সার্থক হবে যখন প্রতিটি মানুষ, তার ভাষা বা ধর্ম, বর্ণ পরিচয় নির্বিশেষে, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারবে।

আরাবল্লী সম্পর্কে নিজেদের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

অমিতাভ সিংহ

অবশেষে স্থগিত হল আরাবল্লী পর্বতমালার পরিবর্তিত সংজ্ঞা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের দেওয়া নিজেদের রায়। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছিল সুপ্রীম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ গত ২০ নভেম্বরে। তিন সদস্য ছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই,বিচারপতি কে বিনোদচন্দ্রন ও বিচারপতি এন ভি অনজারিয়া। তাদের রায়ে বলা ছিল নির্ধারিত এলাকায় অবস্থিত এমন ভূমিকে বোঝায় যা ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তত ১০০ মিটার উঁচু তাকেই পর্বত বলা যাবে। একইসঙ্গে তারা এই ব্যাখ্যাও দিয়েছিল যে দুই বা তার বেশী পাহাড় যারা একযোগে একে অপরের ৫০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে তাহাকেই পর্বতশ্রেণী বলা যাবে। এরপর দেশজোড়া বিভিন্ন স্তরের উদ্বেগ লক্ষ করে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রনোদিত মামলা করে ও গত ২৯ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি জি এ মাসিহ এর বেঞ্চ আগের সব নির্দেশগুলি স্থগিত রেখে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্থা, পরিবেশবিদ ও জাতীয় কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকা ও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেছেন 'আরাবল্লী পরিবেশগত দিক থেকে এক অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকা। মোদী পরিচালিত বিজেপি সরকার তার সংজ্ঞা পাল্টে দিতে চেয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট আগের নির্দেশ স্থগিত রেখে একটা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। একইসঙ্গে আমরা পরিবেশমন্ত্রী ভুপেন্দ্র যাদবের পদত্যাগ দাবী করছি যিনি এই সংজ্ঞাকে নিয়মিত সমর্থন করেছিলেন।'

আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী রক্ষা করা কেন জরুরি?

গুজরাটের হিম্মতনগর, হরিয়ানা,রাজস্থান থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ ৬৯২ কিমি আরাবল্লী পর্বতমালা ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত রক্ষার ঢাল। এটাকে দেশের মেরুদণ্ড বলে মনে করেন পরিবেশবিদেরা। একপাশে থর মরুভূমি, যার ধুলোবালি রাজস্থানের উর্বর সবুজভূমিতে ঢুকতে পারে না এই পর্বতমালা থাকার জন্য। মরুভূমি সর্বদাই গ্রাস করে সমতলভূমিকে। এই পর্বতমালা না থাকলে দিল্লী এনসিআরের একই অবস্থা হত।সেখানকার মানুষেরা শ্বাসপ্রস্বাস ঠিকমত নিতে পারতেন না। শরীরে ছড়িয়ে পড়ত বন্ধাত্বসহ নানারকমের রোগ। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যেত। দিল্লীকে সাহারা মরুভূমি করে দিত,সারা বছর গরম লু বইত এই পর্বতমালা না থাকলে।এই পর্বতমালায় বহু মানুষের খাদ্য যোগান দেয়। পশুপাখির আশ্রয়স্থল। গবাদিপশুর চারণভূমি। এটি না থাকলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে যা সমস্ত প্রাণিজগৎ এর কাছে অত্যন্ত উদ্বেগের ব্যাপার।

সমস্যাটি কি?

ফরেস্ট কনজারভেশন বা বনরক্ষা আইন আরাবল্লী পর্বতমালাকে সুরক্ষা দেয়। কংগ্রেস পরিচালিত মনমোহন সিং সরকার জল জঙ্গল জমি আইন এনে জঙ্গলবাসীদের সুরক্ষা দিয়েছে। বিজেপি দেশের বহু রাজ্যে এই আইনকে এড়িয়ে কর্পোরেট স্বার্থে নির্মাণের অনুমতি দিয়ে পরিবেশ হননের কাজে সহায়তা করেছে। আরাবল্লীতেও তারা একই কাজ করতে চাইছে। কিভাবে তা পরে ব্যাখ্যা করবো।

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক বনরক্ষা আইনের নতুন সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা দিল। সংজ্ঞাটি হল আরাবল্লী পর্বতমালার যেসব পাহাড় ও টিলা ১০০ মিটার উচ্চতার কম তা আর পাহাড় নয়।এক সেন্টিমিটার কম হলে তা হবে সমতলভূমি। সরকারি সমীক্ষা থেকে জানা যায় আরাবল্লীর ১২০৮১ টি পাহাড়ের মধ্যে মাত্র ১০৪৮ টি পাহাড় ১০০ মিটারের চেয়ে উঁচু। ফলে বাকি ১১০৩৩ টি পাহাড় বা ৯১ শতাংশ পাহাড় হারাচ্ছে আইনি সুরক্ষা।

চলে যাচ্ছে পাহাড় সংজ্ঞার বাইরে বা সমতলভূমির পর্যায়ে। পাহাড় না হলে তা বনসংরক্ষণ আইনের আওতায় আসবে কি করে? সেক্ষেত্রে এই ৯১ শতাংশ এলাকায় খনি খনন ও নগোরান্নয়ন করতে আইনি বাধা থাকবে না।

কিন্তু কার স্বার্থে এই উদ্যোগ?

এককথায় কর্পোরেটদের স্বার্থে যারা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বিজেপিকে তোলা হিসাবে দিয়েছে এবং এখন সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে এই বন্ড তুলে দেওয়ার পর কাটমানি হিসাবে বিজেপির দলীয় তহবিলে দিয়ে চলেছে ও ভবিষ্যতে দেবে। যা দিয়ে তারা বিভিন্ন রাজ্যে জনমতের রায়ে নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার ভাঙতে পারে।

কেন বলছি কর্পোরেট স্বার্থ?

এই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে লুকিয়ে আছে মার্বেল,গ্রানাইট, চুনাপাথর ও বহুধরণের ধাতু ও খনিজ সম্পদ। আরাবল্লীর একটা বিরাট অংশকে তাই সমতলভূমিতে রূপান্তর করতে এত আয়োজন। কর্পোরেটগুলো,বিশেষকরে আদানী অম্বানীরা এখানে ঝাঁপিয়ে পরবে খনি খনন করতে। বেড়ে উঠবে সিমেন্ট শিল্প। রিয়েল এস্টেট মাফিয়ারা বড় বড় অট্টালিকা হবে। তাদেরও তো অন্যত্র ব্যবসার জন্য প্রয়োজন এখানের পাথর যা দিয়ে তারা নির্মাণ করে রাস্তাঘাট, হাইওয়ে, বিমান ও সমুদ্রবন্দর,কারখানা ও কংক্রিটের জঙ্গল। তৈরী হবে রিসোর্ট, হোটেলসহ বিভিন্ন নির্মাণ। পাহাড়ে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরী হলে বৃষ্টির জল আর মাটির নীচে পৌঁছানোর রাস্তা পাবে না। গুরুগ্রাম থেকে পিঙ্কসিটি জয়পুর এমনকি দিল্লীতে প্রবল জলসংকট অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রধান বাধা হিসাবে দেখা দেবে।

এসবগুলি হলে ছাড় পাবে না গঙ্গা অববাহিকা। মাটির স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে বৃষ্টির জল শোষণ ক্ষমতাও কমিয়ে দেবে।স্বাভাবিকভাবে জলস্তর কমবে প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিয়মে। ফলে শুধু দিল্লী নয় পুরো উত্তর পশ্চিম ভারতের মানুষেরা প্রানধারনের সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু জল পাবেন না। আবার খনন শুরু হলে সেখান থেকে ধুলো উড়বে। খনিজের ধুলোয় প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। বায়ুদূষণ, জলদূষণ ইত্যাদির কারণে শ্বাসকষ্ট ও শরীরে বিভিন্ন রকমের রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে। পরিত্যক্ত খনি থেকে জমা বর্জ্য ও ধাতু মিশ্রিত জল চুঁইয়ে গিয়ে ভুগর্ভস্থ জলে গিয়ে মিশবে ও তা দূষিত করবে। সেই জল পান করলে যেমন স্বাস্থ্যহানি হবে তেমনি চাষের কাজে তা ব্যবহার করলে জমি ও ফসলে তার প্রভাব পড়বে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে কিভাবে সে প্রতিশোধ নেয় তা আজ সারা বিশ্ব জেনে গেছে। তাই উন্নয়ন ও কর্পোরেট স্বার্থে আরাবল্লী ধ্বংস করা রোধ করতেই হবে যেকোন মূল্যে।

ভিবি-জি রাম জি বিল এর তীব্র বিরোধীতা জারি থাকবে : সোনিয়া গান্ধি

শুভাশিস মজুমদার

কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ২০ ডিসেম্বর অভিযোগ করেছেন, মোদী সরকার এমজিএনআরইজিএ কে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলতে চাইছে, এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, এটি বাতিল করতে চাওয়া 'কালো আইন' এর বিরোধীতা সারা দেশের লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কর্মী ও জনসাধারণ চালিয়ে যাবেন।

একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন যে এমজিএনআরইজিএ কে দুর্বল করে মোদী সরকার দেশের কোটি কোটি কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীনদের স্বার্থের ওপর আক্রমণ করেছে। তিনি অভিযোগ করেন যে গত ১১ বছর ধরে কেন্দ্র গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বার্থ উপেক্ষা করেছে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে সোনিয়া বলেন, ২০ বছর আগের সেই দিনটির কথা তিনি স্পষ্টভাবে মনে রেখেছেন, যখন মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে এমজিএনআরইজিএ আইন পাস হয়েছিল।

সোনিয়া বলেন, এটি 'একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ' এবং বঞ্চিত, শোষিত এবং দরিদ্রতম মানুষের জীবিকার অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, এমজিএনআরইজিএ- র কারণে কাজের সন্ধানে অভিবাসন (মাইগ্রেশন) বন্ধ হয়ে যায়, কর্মসংস্থানের আইনি অধিকার (কাজের অধিকার) প্রদান করা হয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতায়িত করা হয়।

'এমজিএনআরইজিএ- র মাধ্যমে, মহাত্মা গান্ধির গ্রাম স্বরাজের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।' সোনিয়া গান্ধি বলেন ' কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সম্প্রতি সরকার এমজিএনআরইজিএ- র উপর বুলডোজার চালিয়েছে। শুধু মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়াই হয়নি,এমজিএনআরইজিএ-র রূপ ও কাঠামো কোনও আলোচনা ছাড়াই, কারও সাথে পরামর্শ না করে, বিরোধীদের আস্থায় না নিয়ে যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।'তিনি বলেন, নতুন আইনের অধীনে, কে কত কর্মসংস্থান পাবে, কোথায় এবং কীভাবে রূপায়িত হবে, তা দিল্লির সরকারই নির্ধারণ করবে, যা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। এমজিএনআরইজিএ-র সূচনা এবং বাস্তবায়নে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে দাবি করে তিনি বলেন, কিন্তু এটি কখনই দলীয় বিষয় ছিল না।

সোনিয়া তার ভিডিও বিবৃতিতে গ্রামীণ মানুষের উদ্দেশে বলেছেন,'এটি জাতীয় স্বার্থ এবং জনগণের স্বার্থের সাথে যুক্ত একটি প্রকল্প ছিল। এই আইনকে দুর্বল করে, মোদী সরকার সারা দেশের গ্রামীণ ক্ষেত্রের কোটি কোটি কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন দরিদ্রদের স্বার্থের উপর আক্রমণ করেছে। আমরা সকলেই এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। বিশ বছর আগে, আমিও আমাদের দরিদ্র ভাই-বোনদের কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য লড়াই করেছিলাম; আজও, আমি এই কালো আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমার মতো সমস্ত কংগ্রেস নেতা এবং লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কর্মী আপনাদের সাথে আছেন।' কংগ্রেস আগেই বলেছিল যে তারা বাতিল আইনের বিরুদ্ধে লড়াই তৃণমূলে নিয়ে যাবে।

২০ বছরের পুরনো মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন প্রতিস্থাপনের উদ্দেশে ১৮ ডিসেম্বরে সংসদে ভিবি-জি রাম জি বিল পাশ হয়েছে। ওই দিনই বিলটি লোকসভায় পাশ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই রাজ্যসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হয়। বিরোধিদের অভিযোগ, বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার এন্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিলের নামটি এমন ভাবে সাজানো যে আদ্যক্ষর নিলে ভিবি-জি রাম জি বিল নামটি আসে। গান্ধিজীর নামকে মুছে দিয়ে 'রাম' কে আনা হয়েছে, কৌশলে সংখ্যা গুরু ভোট ব্যাংককে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে।

প্রতি বছর ১২৫ দিনের গ্রামীণ মজুরি কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানকারী প্রস্তাবিত বিলটি বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে। এই নতুন বিলের রূপায়ণ হলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হবে যা বর্তমান আইনের উদ্দেশ্য বিরোধী বলে প্রতীয়মান।

নতুন আইন অনুসারে কর্মসংস্থানের জন্য উন্মুক্ত, চাহিদা-নির্ভর আইনি অধিকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমিত বাজেট বরাদ্দ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হবে এই প্রকল্প। এর অর্থ হল, তহবিল শেষ হয়ে গেলে কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে না, যা সঙ্কটের সময় মানুষকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে। কাজ পাওয়ার আইনগত অধিকার নতুন আইনে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন আইনে প্রকল্পের খরচের ৪০ শতাংশ রাজ্যের দায়ভার, যেটা আগে ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। এই আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারের আর্থিক বোঝা অনেক বেড়ে যাবে।

নির্বাচন কমিশন সৃষ্ট অরাজকতা– সিপিআই (এম এল) লিবারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিপিআই (এম.এল)লিবারেশন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার এক বিবৃতিতে বলেছেন, নির্বাচন কমিশন পরিচালিত এসআইআর প্রক্রিয়ায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর শুনানি পর্বে অনীতিনিষ্ঠ, অমানবিক এবং সম্পূর্ণত অরাজক এক পরিস্থিতি তৈরী করা হয়েছে। অশীতিপর, নবতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অশক্ত ও মুমূর্ষু নাগরিকদের প্রবল শৈত্যপ্রবাহ অগ্রাহ্য করে শুনানি কার্যালয়ে হাজির হ'তে বাধ্য করার নজীরবিহীন নির্মমতা ফ্যাসিবাদী চরিত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রযন্ত্রের বশংবদ নির্বাচন কমিশনের যান্ত্রিক, অমানবিক কৌশলকে খোলসা করেছে। এই প্রক্রিয়া বৈধ ভোটার সনাক্তকরণের অছিলায় নাগরিকতা কেড়ে নেওয়ার আতঙ্ককে সর্বব্যাপী করে তোলায় একদিকে বিপন্ন ভোটার, অন্যদিকে বিপুল কাজের চাপে বিএলওদের অনেকেরই মৃত্যু ঘটে চলেছে এবং আতঙ্কে কেউ কেউ আত্মঘাতী হচ্ছেন।

প্রতিবেশী বিহারে শুরু করে মূল লক্ষ্য বাংলায় এই অরাজক, ভয়সঙ্কুল পরিবেশ তৈরী করে বাংলায় মৃত্যু-উপত্যকার আবহ বয়ে আনার সমস্ত দায় নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ আধিকারিকদের নিতে হবে। আমরা নির্দিষ্টভাবে দাবি জানাই বৃদ্ধ,অশক্ত, অসমর্থ নাগরিকদের ভোটাধিকার যাচাই করতে হলে কমিশনকে তাদের বাসগৃহে পৌঁছতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যাচাই প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে অবিলম্বে এই আতঙ্কের অবসান ঘটাতে হবে।

আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি বাংলার সীমান্তবর্তী উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসবাসকারী মতুয়াসহ নিম্নবর্ণ-নিম্নবর্গের নাগরিকদের ভোটাধিকারহীন বেনাগরিক হয়ে যাওয়ার অসহায়তাকে সম্পূর্ণভাবে পাশ কাটিয়ে নির্বাচনী ঘোলাজলে মাছ ধরতে উপর্যুপরি উদ্যোগে প্রথমে উত্তরবঙ্গে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, মধ্যবর্তীপর্বে নদীয়া অভিমুখি প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্থ সফর পরিক্রমা এবং এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্-র বাংলায় আগমন ঘটেছে। বাংলার জনগণের কাঠগড়ায় বিজেপি-আরএসএসের এই মহাবলীদের সামাজিক বিপর্যয়ের দায় স্বীকার করে জবাবদিহি করতে হবে।

মহাত্মা গান্ধির প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধির ' জীবন ও কর্ম বিষয়ে ' তিন খণ্ডে বিস্তারিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হল জ্জ এই প্রকাশনা উপলক্ষে বাংলা আকাদেমির কবি জীবনানন্দ সভাগৃহে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় বিশিষ্ট কলা ও সাহিত্য সমালোচক শমীক বন্দোপাধ্যায় ও গ্রন্থ লেখক বিপুলরঞ্জন সরকার বক্তব্য রাখেন। শমিক বন্দোপাধ্যায় বলেন যে অশুভ শক্তি মহাত্মা গান্ধি কে হত্যা করেছিল তারা এখন ভারতবর্ষের মানুষের মন থেকে গান্ধিজির প্রভাব মুছে ফেলতে সচেষ্ট। তারাই এখন 'মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরালএমপ্লয়মেনট গ্যারান্টি অ্যাক্ট ' বা MGNREGA যা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বলে সারা দেশে পরিচিত, তার নাম পাল্টে মহাত্মার নাম ভুলিয়ে দিতে চাইছে। যে আইন ছিল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার , কিন্তু তা এখন হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের দয়া। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেও গান্ধিজির প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল। তিনি ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহর গান্ধিজি সম্পর্কিত গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনার সঙ্গে পরিচিত। এখন বিপুল বাবুর এই বিশাল রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে তিনি অশেষ উপকৃত হলেন। গ্রন্থ লেখক বিপুল সরকার বলেন তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যৌবন কালেই মার্কসবাদে বিশ্বাসী হন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী থাকলেও সক্রিয় পার্টি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি গান্ধিজির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আগ্রহী হন। গত পনেরো বছর ধরে গান্ধিজির আত্মকথা , রচনা, তাঁর জীবনী ইত্যাদি সম্পর্কে যতোটা সম্ভব অধ্যয়ন করে তিনি তিনখণ্ডে বিস্তারিত এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রী সরকার বলেন তার অর্থাৎ গ্রন্থ লেখকের এবং হয়তো আরো অনেকের ধারণা ছিল বা এখনও আছে গান্ধিজির চিন্তাধারা প্রাক - আধুনিক যুগের। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি অনুধাবন করেছেন গান্ধিজির চিন্তাধারা উত্তর- আধুনিক যুগের। তাঁর পরিবেশ সংরক্ষণ , শান্তি, নারীর অধিকার, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাধারা অবশ্যই উত্তর- আধুনিক। মহাত্মা গান্ধি প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশক বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা ' পুনশ্চ।' আনুষ্ঠানিক ভাবে এদিন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনশ্চ'র পক্ষে সন্দীপ নায়েক জানান গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিস্তারিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০০। গান্ধিজির জীবন ব্যাপী কর্ম ও তাঁর দর্শন এই গ্রন্থে লেখক অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। শ্রী সন্দীপ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বন্ধুতার পাতা

সংকলন ঃ শুভেন্দু দাশগুপ্ত

করিমুল হক।
বসবাস— গ্রাম রাজাডাঙা, ব্লক ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি।
এক সময় দেবপুর চা বাগানে কাজ করতেন।
মা মারা গেলেন। সঠিক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে মায়ের চিকিৎসা করাতে পারেননি।
তার মায়ের মতো আর কারোর যেন সঠিক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স না পাবার কারণে মৃত্যু না হয়, নিজের মোটর বাইকটিকে অ্যাম্বুলেন্স হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবলেন। শুরু হলো করিমুলের মোটর বাইক অ্যাম্বুলেন্স।
তখন মোবাইল ইন্টারনেট আসেনি। কেউ অসুস্থ হলে মুখে মুখে খবর হতো। খবর পেলেই চা বাগানের কাজ ফেলে রোগীকে মোটর বাইকে চাপিয়ে হাসপাতালে।
অসংখ্য মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন করিমুল। এলাকায় করিমুলের এখন নাম বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা।

বন্ধুতার পাতা

সংকলন ঃ শুভেন্দু দাশগুপ্ত

মানিকপুরের গ্রাম বেল্লা।
মন্দির ও মাজারের পাশাপাশি অবস্থান।
১৯২০ থেকে রামনবমীর প্রথম শুক্রবার বেল্লা গ্রামের মেলা।
মন্দির আর দরগা/পীরের মাজার পাশাপাশি। মন্দিরে যেতে যাওয়ার রাস্তা দরগা/পীরের মাজারের সিঁড়ি দেওয়া।

মন্দিরের কারিকুরি এবং অলংকার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, এই পথের ঐতিহ্য আলাদা, যেখানে কোনো বদল আনা হয়নি। ইমনাথ ধরে অনুবার ঘুরেছি পারি। মন্দিরের পাশেই যেহেতু বাজার, কিন্তু দোকানি ছিল না, তখন থেকেই সিন্নি দেওয়া শুরু হয়েছিল। তা সেবায়েতরা যুগের পর যুগ বহন রেখেছেন।

মন্দিরের কথা শোনা যায় 'হিন্দুদের নারায়ণী, মুসলমানের পীর'। এই বিশ্বাসে টান খায়নি আজও। বহু সমাজ আলোচকদের মতে মুসলমান সত্যপীর ও হিন্দু সত্যনারায়ণ মূলত: একই বিশ্বাস ও আচারের প্রতিনিধি। যুগে যুগে কেমন করে দক্ষিণরায় ও পীর বড়খাঁ গাজির খেলাল যুদ্ধ থামাতে হিন্দু মুসলমানের মিলিত দেবতা এই — আবির্ভূত — পয়গম্বরীর (কৃষ্ণ পয়গম্বর) আবির্ভাব ঘটেছিল। কিছুটা বিশ্বাস, কিছুটা কিংবদন্তী। এই ঘটনার কথা পাওয়া যায় কৃষ্ণরাম দাসের 'রায় মঙ্গল' কাব্যে, তিনি লিখেছেন —

'অর্ধেক মাথায় কালো একভাগা চূড়া টানা / বনমালা ছিলিমিলি তাতে / ধবল অর্ধেক কায়, অর্ধ নীল মেঘ প্রায় / কোরান পুরাণ দুই হাতে।'

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা ও পুরাণ ও পীরদের সম্পর্কে প্রচলিত নানা অলৌকিক বা রূপকাহিনীর সৃষ্টি বিভিন্ন ঘটনা শুরু করেছিল। সপ্তদশ শতকে লেখা বনবিবির এই নানা কাব্যে একই সুরের সাধনা। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে শ্রীচৈতন্যের হাত ধরে বিনা রক্তে যে ধারা নবরূপে দেখা দিয়েছিল তার সুবাদেই সপ্তদশ শতকে দেখা যায় হিন্দুর নারায়ণ ও মুসলমানের পীর এক দেহে লীন

হয়ে গিয়েছে। তাই বাংলার
নানা জেলায় আনাচে কানাচে
রয়েছে এমন বাজার।
সাধক ফয়জুল্লার পাশে রয়েছে
'হিন্দু মেয়ো আমি মুসলমানের পীর/
দুই কূলেতে পূজা পাই, দুই কূলেতে
জাহির।'

সিনেমার নাম 'হোম বাউন্ড'।
দুই বন্ধু শোয়েব আলি আর
চন্দন কুমারের বন্ধুত্ব নিয়ে
সিনেমা — হোমবাউন্ড।
এই সিনেমায় আমাদের দেশের
অনেক মানুষের বেঁচে থাকার
জন্য প্রাত্যহিক লড়াই।
আমাদের দেশে করোনা অতিমারীর
সময় মানুষের চূড়ান্ত দুরবস্থার
আবহে মুসলমান হিন্দু
দুই বাল্য বন্ধুর একসাথে
বাঁচার গল্প।

[illegible] সমাজকে [illegible] দেখাচ্ছে
দেশে এখনও মুসলমানদের [illegible]
পাকিস্তানি! [illegible] দেশে থাকা
— এমন সব বিষয়ের চিত্রায়ন।
[illegible] মুসলিম হওয়ায় আলাদা
সহ, কটাক্ষ, অপমান ও [illegible]
ক্রিকেট দলের এক ভক্ত শোয়েবকে
[illegible] বলতে সন্দেহ, অপমানিত।
পরিচয় যাচাইয়ে মা, বাবার ও
নিজের আধার কার্ড জমা রাখার
ঘটনা দেখে মনে ওঠে একটি
জনগোষ্ঠীর প্রতি দেশের
একটা [illegible] ভাবনা।
নিম্ন বর্ণের সাধারণ মানুষও
জাত, ধর্ম ভুলে এক সাথে বেঁচে
থাকতেই চাইবেন সে কথাও
বার বার উঠে এসেছে।
[illegible] শোয়েবের মায়ের
চোখের জন্য আলাদা করে
টাকা [illegible] সরিয়ে রাখা
থেকে কোভিডের সময় ঘরে
ফেরা হিন্দু মুসলমানদের স্বাভাবিক
সম্প্রীতির রসায়নই পাশে থাকা
প্রতিবেশী দেয় কোনও [illegible]